# ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)

(৮০–১৫০ হিজরী)

## জীবন ও অবদান

**মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী**
চেয়ারম্যান, আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
উস্তায, বায়তুশ শরফ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা, চট্টগ্রাম

**আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন**

**ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.): জীবন ও অবদান**
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: জুমাদাল উলা ১৪৪১ হি. = জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৬৯, বিষয় ক্রমিক: ১০

**© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত**

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
**আল-মানার লাইব্রেরী**, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
**মুহাম্মদী লাইব্রেরী**, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
**ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী**, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
**বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী**, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

**মূল্য: ২০০ [দুইশত] টাকা মাত্র**

***Imam Azam Abu Hanifa (Rh.) Jibon O Obodan*:** By: Mohammad Abdul Hai An-Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 200 Tk

e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com
saajctg@yahoo.com
www.saajbd.org

## সূচিপত্র


নাম, বংশ ও জন্মপরিচয় ..... ৯
বংশের ধারাবাহিকতা ..... ১০
যূতী গোলাম ছিলেন না ..... ১০
যূতীর জন্মভূমি কোথায়? ..... ১২
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ ..... ১৩
তিনি কেন রিওয়ায়াত করেননি? ..... ১৪
ডাক নাম সম্পর্কে দুটি কথা ..... ১৬
ইলম শিক্ষা: শায়খ ও উস্তাদ ..... ১৬
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর সৎকার্যকলাপ ..... ১৭
ইলমে কালাম ..... ১৯
ইলমে কালামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত ..... ১৯
ফিকহ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ..... ২০
উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও বুযুর্গি ..... ২১
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হাদীস শিক্ষা ..... ২২
বাসরা ..... ২৪
ইলমে হাদীস, রিওয়ায়াত ও সূক্ষদর্শিতার মাসআলা ..... ২৪
ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) ..... ২৫
হাফিয সিমাক ইবনে হারব আয-যুহলী (রহ.) ..... ২৬
ফকীহ মুহারিব ইবনে দিসার আস-সাদুসী (রহ.) ..... ২৬
ইমামে হাদীস হিশাম ইবনে আরওয়া আল-আসাদী (রহ.) ..... ২৬
ইমাম সুলাইমান ইবনে মাহরান আল-আ'মাশ (রহ.) ..... ২৬
মুহাদ্দিস ও তাবিয়ীরূপে হাফিয কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহ.) ..... ২৭
হাদীসে আমীরুল মুমিনীনরূপে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-আযদী (রহ.) ..... ২৭
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মক্কা-মদীনা ভ্রমণ ..... ২৮
ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ আল-কুরাশী (রহ.)-এর শিক্ষা-মজলিস ..... ২৯
হাফিয আবু আবদুল্লাহ ইকরামা (রহ.) ..... ৩০
সাত ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম ..... ৩১
হাদীসের সনদ লাভ ..... ৩২
ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ও ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ..... ৩৩
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পদ-গৌরব ..... ৩৫
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) ..... ৩৬
হাদীস শিক্ষার বিভিন্ন ধারা ..... ৩৬
শিক্ষা-ধারার ক্রমোন্নতি ..... ৩৭
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ..... ৩৮
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খদের বিস্তারিত বিবরণ ..... ৩৯
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তাহকীক ও সতর্কতা ..... ৪০
শিক্ষা মজলিস ও জীবিকা নির্বাহের উস্তাদের প্রতি আদব ..... ৪১
শিক্ষা-মজলিসের বিস্তৃতি ..... ৪৩
পদগ্রহণে অস্বীকৃতি ..... ৪৩
আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ও আবু জাফর আল-মনসুরের রক্তপিপাসা ..... ৪৬
মুহাম্মদ আন-নাফসুয যাকিয়া (রহ.) ও ইবরাহীমের বিপ্লব ..... ৪৭
ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)-এর পাশে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ..... ৪৮
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মৃত্যুশোক ..... ৪৯
শোক-গীতি ..... ৫০
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সন্তান-সন্ততি ..... ৫১
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর স্বভাব-চরিত্র ও আমল-আখলাক ..... ৫২
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রশংসায় ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ..... ৫৩
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শারীরিক গঠন ও আলাপ-আলোচনা ..... ৫৪
পোশাক ..... ৫৪
দরবারি টুপি ..... ৫৪
সরকারি প্রভাব হতে মুক্ত থাকা ..... ৫৫
স্বাধীনচেতা মনোভাব ..... ৫৬
নিঃস্বার্থ সত্য-প্রচার ..... ৫৬
ব্যবসা ও দিয়ানত ..... ৫৭
দানশীলতা ..... ৫৮
ছাত্রদের প্রতি আচরণ ..... ৫৮
মহানুভবতা ..... ৫৯
হৃদয়ের প্রশস্ততা ..... ৫৯
পরদুঃখ-কাতরতা ..... ৫৯
ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা ..... ৬০
অপ্রিয় ব্যবহারের জবাব ..... ৬১

প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয়তা ..... ৬২
মাতৃ-সেবা ..... ৬৩
কুসুমের মতো মৃদু এবং পর্বতের ন্যায় অটল ..... ৬৪
জিহ্বার সতর্কতা ..... ৬৫
যিক্‌র ও ইবাদত ..... ৬৬
রোদন প্রবণতা ..... ৬৭
গায়েবি সতর্কতা ..... ৬৮
প্রাত্যহিক সাধারণ কর্তব্য ..... ৬৮
ঈমানদারি ..... ৬৯
ফাতওয়া-সংকট ..... ৬৯
দীন ও দুনিয়া ..... ৭০
কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর হেদায়তনামা ..... ৭১
কবিতা আবৃত্তি ..... ৭৫
উপস্থিত বুদ্ধি ..... ৭৫
সঙ্কটময় মীমাংসা ..... ৭৭
একটি হৃদয়গ্রাহী ফাতওয়া ..... ৭৮
খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ..... ৭৮
খারিজিদের দুর্ব্যবহার ..... ৭৯
আরও একটি ঘটনা ..... ৮০
উদারতা ..... ৮২
ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর গ্রন্থাবলি, চিন্তাধারা ও গবেষণা ..... ৮৩
ফিকহুল আকবর ..... ৮৩
আমল ও ঈমান ..... ৮৫
ঈমান ও আমল দুইটি পৃথক বস্তু ..... ৮৬
মুরজিয়া-বিভ্রাট ..... ৮৭
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পত্র ..... ৮৯
ঈমান কম-বেশি হওয়া ..... ৯১
ঈমানের দিক দিয়ে সকলই সমান ..... ৯২
কেবলাঅলাগণ সব মুমিন ..... ৯৪
হাদীস ও উসুলে হাদীস ..... ৯৫
মুজতাহিদও মুহাদ্দিসে পার্থক্য ..... ৯৬
খুলাফায়ে রাশিদীনের অল্প হাদীস-বর্ণনা ..... ৯৬



ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সাথে ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলমানের সম্পর্ক . ৯৭
মুহাদ্দিসদের মধ্যে দুইটি দল ..... ৯৮
আহলে রায় উপাধি ..... ৯৮
ইজতিহাদের শর্ত মুজতাহিদরূপে ইমাম আবু হানিফা ..... ১০১
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ... ১০১
হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ..... ১০২
হযরত ওমর (রাযি.) ও হাদীস-প্রচার ..... ১০৩
হাদীস সংকলনে অসাবধানতার কারণ ..... ১০৬
হাদীসের সাথে অহাদীস কিভাবে মিশল? ..... ১০৭
হাদীসে রদবদল ও রূপ পরিবর্তন ..... ১০৮
সহীহ হাদীস অতিকম ..... ১০৮
তিনি কার ভক্ত ছিলেন? ..... ১০৯
রিওয়ায়াতে ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ..... ১০৯
সহীহ হাদীস ও ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ..... ১১০
রিওয়ায়াতের নির্দিষ্ট শর্তাবলি ..... ১১০
ভাব-ধারার ভিত্তিতে রিওয়ায়াত ..... ১১৩
ভাব-ধারানুযায়ী রিওয়ায়াতের সতর্কতা ..... ১১৩
উদ্দেশ্য সাধনে সাহাবায়ে কেরামের কম বেশি ..... ১১৫
ভাব-ধারানুযায়ী রিওয়ায়াতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উসুল ..... ১১৫
উসুল-অনুভূতি ..... ১১৭
যে হাদীস অকাট্য বুদ্ধির বিরোধী তা সহীহ নয় ..... ১১৮
হাদীস ও কিয়াস ..... ১১৯
কিয়াসের বিভিন্ন অর্থ ..... ১২০
তাহকীক ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার পন্থা ..... ১২১
হাদীসের স্তরসমূহ ও পার্থক্য ..... ১২৩
মুতাওয়াতির ..... ১২৪
মশহুর ..... ১২৪
আহাদ ..... ১২৪
আখবারে আহাদ সম্পর্কে দুটি কথা ..... ১২৫
হাদীসকে ধারণামূলক বলার কারণসমূহ ..... ১২৬
দুরস্তি-ত্রুটি সম্পর্কে মতবিরোধ ..... ১২৭
একভাবাপন্ন হাদীস ..... ১২৯

লোক-যাচাই ..... ১২৯
রিওয়ায়াতের ত্রুটি ও শুদ্ধি সম্পর্কে মতবিরোধ ..... ১৩০
উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা ..... ১৩১
খবরে ওয়াহিদ অকাট্য নয় ..... ১৩৩
ইলমে কালামে এর প্রভাব ..... ১৩৩
ফিকহের বৈশিষ্ট্য ..... ১৩৪
ইলমে ফিকহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ..... ১৩৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ..... ১৩৬
ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) ..... ১৩৮
ফিকহ-সংকলন ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ..... ১৩৯
ফিকহ-যাচাই ও ছাত্র-সহায়তা ..... ১৪০
যাঁচাই-কষ্টিপাথর ..... ১৪১
ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) ..... ১৪২
সভার সাধারণ নিয়ম ..... ১৪২
অধিকাংশ শাসনকর্তাই হানাফী ছিলেন ..... ১৪৩
হানাফী মাযহাবের জনপ্রিয়তা ..... ১৪৪
অন্যান্য ইমামদের প্রসার লাভের ভিত্তিভূমি ..... ১৪৬
ফিকহ-সংক্রান্ত মাসায়িলের তফসীর ..... ১৪৮
মাযহাবী ও অ-মাযহাবী হাদীসাবলির পার্থক্য ..... ১৪৯
যে মাসআলা তশরীয়ী নয় ..... ১৫১
মাসআলা যাচাই কখন শুরু হয়? ..... ১৫৩
ওসায়িল ইবনে আতা ও ফিকহের কিছু কায়দা ..... ১৫৩
উসুলে ফিকহের ভিত্তিভূমি ..... ১৫৪
হানাফী ফিকহ ও রাজ্য পরিচালনা ..... ১৫৫
হানাফী ফিকহ ও বুদ্ধি-কষ্টিপাথর ..... ১৫৫
ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযীর মতামত ..... ১৬০
হানাফী ফিকহ ও যাকাতের মাসায়িল ..... ১৬২
হানাফী ফিকহ অতিসহজ ও সরল ..... ১৬৩
হানাফী ফিকহ অত্যন্ত ব্যাপক ও সভ্যতা-মুখী ..... ১৬৪
শরীয়ত ও হানাফী মাযহাব ..... ১৬৫
হানাফী ফিকহ হাদীস-বিরোধী নয় ..... ১৬৬
এক তায়াম্মুমে কয়টি ফরয আদায় হতে পারে ..... ১৬৮



পানি ও তায়াম্মুম ..... ১৬৮
প্রতিশোধ গ্রহণ ..... ১৬৮
অংশবণ্টন ..... ১৭১
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিখ্যাত ছাত্র ..... ১৭১
মুহাদ্দিস-ছাত্র ..... ১৭২
১. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.) ..... ১৭২
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ..... ১৭৩
৩. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা (রহ.) ..... ১৭৪
৪. হযরত ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (রহ.) ..... ১৭৫
৫. হযরত শায়খ দাউদ তায়ী ..... ১৭৫
৬. ফিকহ-বিশারদ কাজী ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ..... ১৭৬
৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.) ..... ১৮১
আল-জামিউস সগীর ..... ১৮৪
আল-জামিউল কবীর ..... ১৮৪
যিয়াদত ..... ১৮৫
কিতাবুল হজ ..... ১৮৫
সিয়ারুস সগীর ও সিয়ারুল কবীর ..... ১৮৫
গ্রন্থপঞ্জি ..... ১৮৭

# ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)

## নাম, বংশ ও জন্মপরিচয়

তাঁর আসল নাম: নু'মান। ডাক নাম: আবু হানিফা ও উপাধি: ইমাম আ'যম। তাঁর বংশধারা: নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যূতী ইবনে মাহ-এর প্রতি লক্ষ করলেই তাঁদের ধারাবাহিক নাম প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অধিকাংশ লোকের ধারণা হচ্ছে, তিনি আজমী ছিলেন। এ সম্পর্কে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে যে, তিনি কোন বংশের লোক ছিলেন এবং আরবে তাঁদের বসবাস কিভাবে আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পৌত্র ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (রহ.) থেকে নিম্নলিখিত বর্ণনা বিবৃত করেছেন,

«أَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمَّادٍ ابْنِ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمَرْزِبَانِ، مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ الْأَحْرَارِ، واللهِ مَا وَقَعَ عَلَيْنَا رِقٌّ قَطُّ».

'আমি ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনুন নু'মান ইবনে সাবিত ইবনুন নু'মান ইবনুল মারযিবান; আমরা পারস্যের অধিবাসী, আমাদের কেউ কোনো দিন গোলামি করেননি।'[১]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পিতা সাবিত শৈশবে হযরত আলী (রাযি.)-এর খেদমতে হাজির হন। শেরে খোদা হযরত আলী (রাযি.) তাঁর ও তাঁর খান্দানের মঙ্গলের জন্য দুআ করেন। আমাদের ভরসা এ দুআ ব্যর্থ হওয়ার নয়। তা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনে পরিপূর্ণভাবে মূর্ত হয়ে ওঠেছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পৌত্র ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দাদার নাম: নু'মান এবং পরদাদার নাম: মারযিবান বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ সাধারণত তিনি যূতী এবং মাহ নামে পরিচিত। খুব সম্ভবত যূতী যখন ঈমান আনেন তখন তাঁর নাম নু'মান হিসেবে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

[১] আল-খতীবুল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৭



## বংশের ধারাবাহিকতা

বংশের ধারাবাহিকতার পরিচয় দানকালে ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (রহ.) সেই ইসলামি নামের উল্লেখ করেন। মুসলিম সমাজ তা মেনে নিয়েছে। যূতীর পিতার সম্ভবত অন্য আসল নাম ছিল, আর মাহ ও মারযিবান উপাধি ছিল, তাঁরা পারস্যের এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। শহর-নেতাকে পারস্যে মারযিবান বলা হত। এজন্য অনেকটা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, মাহ ও মারযিবান নাম নয়, উপাধিমাত্র। মাহ ও মারযিবান শব্দদ্বয়ের একই অর্থ দাঁড়ায়।

## যূতী গোলাম ছিলেন না

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দাদা যূতী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, গ্রেফতার অবস্থায় যূতী কাবুল হতে আসেন এবং বনি তাইমুল্লাহ ইবনে সা'লাবার জনৈক স্ত্রীলোক তাঁকে ক্রয় করেন। তিনি সেই স্ত্রীলোকের গোলামিতে কিছুকাল যাপন করেন। তারপর ওই স্ত্রীলোক তাঁকে আজাদ করে দেন। এজন্যই ইমাম বংশকে মাওলা বনি তাইমুল্লাহ বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরোধীদের মধ্যে যারা তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন করার নেশায় অন্ধ ও দিশাহারা ছিল তারা এসব বর্ণনাকে বেশ জোরালোভাবে প্রচার করে। আর যদি তাঁর গোলামি করা সাব্যস্তও হয়ে যায়, তবে তাও বাস্তবপক্ষে তেমন কোনো আপত্তিজনক হতে পারে না। সময়ে সময়ে কিছু ঘৃণ্য চক্র রাজ-পরিবারের লোকের নামেও এমন কলঙ্ক ও কালিমা লেপন করে থাকে।

মুসলিম জাহানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী হযরত হাজারা (আ.)ও বাঁদি হিসেবে পরিচিত। ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রায় অধিকাংশ এমন লোকই হাদীস বর্ণনা করতেন এবং রিওয়ায়াতকারী এমন বহু ইমামও পরিদৃষ্ট হন যাঁদের নামের ওপর এর ছাপ ছিল। হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.), হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.), হযরত তাঊস ইবনে কায়সান আল-ইয়ামানী (রহ.), হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.), হযরত নাফি' মাওলা ইবনে ওমর (রহ.), হযরত ইকরামা ইবনে আবদুল্লাহ মওলা ইবনে আব্বাস (রহ.) ও হযরত মাকহূল ইবনে আবদুল্লাহ আল-হুযালী (রহ.) প্রমুখ যেসব জনগণমান্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাঁরা নিজেরা বা তাঁদের বাপ-দাদা গোলামি

করতেন। যূতী গোলাম ছিলেন বলে যদি প্রমাণিত হয় তবে তাতেও কিছু আসে যায় না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বংশ-পরিচয় সম্পর্কে অভিমতও রয়েছে। হাফিয আবু মুতী' আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ আল-বালখী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে আরবের আনসারী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, তিনি নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যূতী ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে রাশিদ আল-আনসারী।[১] ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বংশ-পরিচয় বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে তাউস ইবনে হুরমুয মালিক বনী শায়বান।[২]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দাদা যূতীর সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। আর এ মতবিরোধের ভিত্তিভূমিও রয়েছে। যূতী যখন সর্বপ্রথম আরবে আসেন তখন থেকে দীর্ঘ সময় তাঁকে অজ্ঞাত ও অপরিচিত হিসেবেই কালাতিপাত করতে হয়েছিল। আর ভাষায় পার্থক্য থাকায় আরব অধিবাসীদের সাথে তাঁর পরিচয় হতে বেশ সময়ও লাগছিল। সুতরাং জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে আলাপ-পরিচয় ও সৌহার্দ অপরিহার্য হয়ে ওঠেছিল।

আরবে এর প্রয়োজনও ছিল প্রকট। এ রীতি আরবে সুপ্রচারিত ছিল। আরবে এটাকে 'ওয়ালা' বলা হত। এ থেকেই 'মাওলা' শব্দ বের হয়েছে, এটি এক অর্থে গোলামকেও বলা হত। শব্দের এ মারপ্যাচের দরুন যূতীকে অনেকে গোলাম বলতেও দ্বিধাবোধ করতো না। আর আস্তে-ধীরে এটা বিকৃতির আকার ধারন করে। অবশেষে এটা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পৌত্র হযরত ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (রহ.)-কে বলতে হয়েছিল, 'আল্লাহর কসম, আমার বংশ কোনো দিন কারও গোলামি করেননি।'[৩]

হযরত ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (রহ.) পরম সম্মানী ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। এজন্যই সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক তাঁর অভিমতের ওপর সবিশেষে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রসিদ্ধ ফকীহ ও কাযী আবু আবদুল্লাহ আস-

[১] আবদুল হাই লাখনবী, *আস-সিআয়া ফি কাশফি শরহিল বিকায়া*, খ. ১, পৃ. ২৯

[২] (ক) আবদুল হাই লাখনবী, *আস-সিআয়া ফি কাশফি শরহিল বিকায়া*, খ. ১, পৃ. ২৯; (খ) আবদুল হাই লাখনবী, *আন-নাফি'উল কবীর শরহুজ জামি আস-সগীর*, পৃ. ৪১

[৩] আল-খতীবুল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৭



সায়মারী (রহ.) সুস্পষ্টরূপে বিবৃতি দিয়েছেন যে, 'যূতী বনি তাইমুল্লাহ ইবনে সা'লাবার সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ ছিলেন।'[১]

যেসব রিওয়ায়াত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দাদা যূতীর গোলামি করার বর্ণনা পাওয়া যায় সেসব বর্ণনা অনুযায়ী একথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, তিনি কাবুল হতে গ্রেফতার হয়ে এসেছিলেন, ফারসি ভাষায় যূতীর বাপ-দাদার নাম রাখা হয়েছিল। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বংশগতভাবেই তিনি ফারসি ভাষা অবগত ছিলেন। অথচ একথা কেন না জানেন যে, কাবুলের ভাষা ফারসি ছিল না!

## যূতীর জন্মভূমি কোথায়?

তিনি কোন শহরের অধিবাসী তা বলা কঠিন। ইতিহাসবিদগণ বিভিন্ন শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনোটার প্রতিই আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে পারি না। তবে এতটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি পারস্য দেশের অধিবাসী ছিলেন। সেই দেশ তখন ইসলাম প্রভাবান্বিত ছিল। আর সেই দেশের অধিকাংশ প্রধান গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দাদা যূতী সম্ভবত তখনই ইসলাম কবুল করেন। এজন্য তাঁর বংশধররা ও দেশবাসী তাঁর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ধর্ম না বাঁচলে সেই দেশে মুসলমান বসবাস করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের পক্ষে হিজরতের নির্দেশও কুরআনে রয়েছে। বাহ্যিকভাবে তা অনেকের পক্ষে অপ্রীতিকর মনে হলেও এতে কল্যাণ ও চরম সার্থকতা নিহিত আছে। কুরআন শরীফে ঘোষণা রয়েছে,

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۚ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত-স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে।'[২]

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা যখন মক্কা হতে আবিসিনিয়া ও মদীনায় হিজরত করেন তখন এ সত্য সুপ্রমাণিত হয়েছিল। তখন শুধু আবিসিনিয়া ও মদীনাই তাঁদের করতলগত হয়নি, মুসলমানদের এ বেপরোয়া ভাবই তাঁদেরকে একদিন অর্ধপৃথিবীর মালিক করে তুলেছিল। আজকের

[১] আস-সায়মারী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী*, পৃ. ১৫

[২] আল-কুরআন, *সুরা আন-নিসা*, ৪:১০০

মুসলিম জাহান যদি সনাতন ইসলামের শুধু এ অমূল্য আদেশটুকু পালন করে তবে মুসলিম জাহান তথা সারা বিশ্বের আমূল পরিবর্তন সাধিত হত।

মুসলিম জীবন পালন করলে অচিরেই বিদেশও স্বদেশ হয়ে যায়। যূতীর দেহে ইসলামের-রক্ত প্রবাহিত ছিল। সুতরাং দীনকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি ইসলাম-ভূমি আরবে রওয়ানা হয়েছিলেন। হযরত আলী (রাযি.) তখন খলীফার আসনে সমাদৃত। কুফা নগরী ছিল খিলাফতের রাজধানী। সুতরাং যূতী কুফায় বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। তিনি মাঝে-মাঝে খলীফার দরবারেও যাওয়া-আসা করতেন। তাঁর আলাপ-আলোচনা, আদব-কায়দায় ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত।

তখন যূতী একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো সাবিত। তিনিই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পিতা। যূতী তাঁর পুত্রকে হযরত আলী (রাযি.)-এর খেদমতে নিয়ে গেলেন। শেরে খোদা হযরত আলী (রাযি.) শিশুটিকে স্নেহ-আদর করলেন। তারপর শিশুটি এবং তাঁর বংশধরের জন্য তিনি দুআ করলেন। সাবিত যৌবনে পদার্পণ করলে, তিনি ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ আরম্ভ করলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেন। তাঁর নাম রাখা হল: নু'মান। তিনিই একদিন পরিণত বয়সে ইমাম আযমে পরিণত হন।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ

আবদুল মালিক ইবনে মরওয়ান মরওয়ানী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বাদশারূপে পরিগণিত হন। তখন সেই পবিত্র যুগ ছিল যে, সেসব লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারা মুবারক নিজ চোখে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের কতিপয় লোক তখনও পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যৌবনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন। তিনি হিজরী ৯৩ সালে ইন্তিকাল করেন।

তাঁদের মধ্যে আরেকজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযি.) ৯১ সালে ইন্তিকাল করেন, হযরত আবুত তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.) ১১০ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর বাপ-দাদা ছিলেন ব্যবসায়ী। কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, তিনি সেই আবহাওয়াতেই জন্মলাভ ও লালিত পালিত হন। ইতোমধ্যে ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.)-এর হিদায়তের ফলে তিনি শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েন।



## তিনি কেন রিওয়ায়াত করেননি?

মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, হাদীস শিক্ষার জন্য অন্ততপক্ষে কত বয়স হওয়া আবশ্যক। কুফাবাসীগণ এ সম্পর্কে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁদের মতে বিশ বছর কম বয়সের লোকের পক্ষে হাদীসের জমায়েতে শামিল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। হাদীসের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পরিণত বয়সের লোক হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় হাদীস বোঝা ও বোঝানো উভয়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ান। এতে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা ছিল।

তিনি যদি দশ বছর বয়সে সাহাবায়ে কেরামের কাছ হতে হাদীস শুনে থাকতেন তবে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হত। অবশ্য সেসব লোক স্বচক্ষে নবী করীম (সা.)-কে দেখছিলেন তিনি তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) লিখছেন,

أَدْرَكَ الْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ بِالْكُوْفَةِ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَبِهَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَىٰ ﷺ، فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْاتِّفَاقِ، وَبِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ أَنَسٍ بْنُ مَالِكٍ ﷺ، وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعِيْنَ أَوْ بَعْدَهَا.

وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ: أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ رَآىٰ أَنَسًا ﷺ، وَكَانَ غَيْرَ هَذَيْنِ فِي الصَّحَابَةِ بِعِدَّةٍ مِّنَ الْبِلَادِ أَحْيَاءً.

وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ جُزْءًا فِيْمَا وَرَدَ مِنْ رِّوَايَةِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَلَكِنْ لَا يَخْلُوْ إِسْنَادُهُ مِنْ ضَعْفٍ.

'ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানায় কয়েকজন সাহাবী জীবিত ছিলেন। তিনি কুফানগরে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কুফায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) জীবিত ছিলেন।

ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, 'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে দেখছেন। এ দু'জন

সাহাবী ব্যতীত অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও বিভিন্ন শহরে তখন জীবিত ছিলেন।'[১]

তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করলেও সেসব হাদীসের সনদ দুর্বলতা হতে মুক্ত।'[২]

একথা অকাট্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের সমসাময়িক লোক ছিলেন এবং কতিপয় সাহাবায়ে কেরামকেও তিনি দেখেছেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাবিয়ী ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (রহ.) বলেন,

حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيْفَةَ، يَقُوْلُ: «رَأَيْتُ أَنَسًا ﷺ».

'হযরত সাইফ ইবনে জাবির (রহ.) বর্ণনা করেছেন, তিনি নিজে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, 'আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-কে দেখেছি।'[৩]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (রহ.) সম্পর্কে আল্লামা শরফুদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী (রহ.) তাঁর *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* কিতাবে লিখেছেন যে, যদিও তাঁর শায়খ সেই সময়ের জন্য খুব বিশ্বাসযোগ্য নন, কিন্তু তিনি নিজেই পরম বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন।

হযরত সাইফ ইবনে জাবির (রহ.) বাসরার কাজী ছিলেন এবং সহীহ বর্ণনাকারী ছিলেন। এ বর্ণনা এতদূর সত্য ও সুপ্রমাণিত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী হাদীসও এরচেয়ে অধিক সত্য হতে পারে না। এরই ভিত্তিতে বিখ্যাত মুহাদ্দিসীন যেমন– খতীব আল-বাগদাদী (রহ.), *আল-আনসাব* প্রণেতা আল্লামা আবদুল করীম আস-সাম'আনী (রহ.), *সহীহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাতা আল্লামা শরফুদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী (রহ.), হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও হাফিয যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী (রহ.) প্রমুখ যাদের ওপর আজও হাদীস ও রিওয়ায়াত

[১] মোল্লা আলী আল-কারী, ***শরহু মুসনাদি আবী হানীফা***, খ. ১, পৃ. ৫৮১

[২] আস-সুয়ুতী, ***তাবয়ীযুস সহীফা বিমানাকিবি আবী হানীফা***, পৃ. ২৯৬–২৯৭

[৩] (ক) আয-যাহাবী, ***মানাকিবুল ইমাম আবী হানিফা ওয়া সাহিবায়হি***, পৃ. ১৪; (খ) আয-যাহাবী, ***তাযকিরাতুল হুফ্ফায = তাবকাতুল হুফ্ফায***, খ. ১, পৃ. ১২৬–১২৭, ক্রমিক: ১৬৩/১০-৫



নির্ভর করে, তাঁরা প্রত্যেকেই এর সুস্পষ্টভাবে মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.)-কে দেখেছেন।

## ডাক নাম সম্পর্কে দুটি কথা

তিনি 'আবু হানিফা' নামেই অধিক পরিচিত। এটি তাঁর প্রকৃত নাম নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কোনো ছেলের নাম হানিফ ছিল না। তাঁর গুণের পরিচয় দেওয়ার মানসেই তাঁকে 'আবু হানিফা' নামে ডাকা হতো। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে লক্ষ করে বলেছে,

فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

'ইবরাহীমের তরীকার পায়রবি কর যিনি শুধু এক আল্লাহর হয়ে জীবন যাপন করেছিলেন।'[১]

এ অর্থে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে 'আবু হানিফা' বলে ডাকা হতো।

## ইলম শিক্ষা: শায়খ ও উস্তাদ

খলীফা আবদুল মালিকের তরফ হতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইরাকের গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত হন। তখন সারা দেশ অত্যাচার-অবিচারে জর্জরিত ছিল। ধর্মপরায়ণ লোকদের বিরোধিতার দরুণ তখনও আরব ও ইরাকে মরওয়ানী শাসন প্রবর্তিত হতে পারেনি। সুতরাং তাদের প্রতিই হাজ্জাজ সর্বাধিক ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) অত্যন্ত সততার সাথে বলেছেন যে, অন্যান্য সব পয়গাম্বরের উম্মতগণ সকলে মিলিতভাবে যদি নিজ নিজ সময়কার সমুদয় অপকর্মকারীদেরকে এক পাল্লায় রাখেন এবং আমরা যদি শুধু হাজ্জাজের অপকর্মকারীদেরকে এক পাল্লায় রাখি এবং আমরা যদি শুধু হিজাযের অপকর্মকারীদেরকে অপর এক পাল্লায় রাখি তবে আল্লাহর কসম আমাদের পাল্লা অধিক ভারি হবে।

আবদুল মালিক হিজরী ৮৬ সালে ইন্তিকাল করেন। তারপর তাঁর পুত্র ওয়ালীদ সিংহাসনে বসেন। ওয়ালীদের শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যে সুদূর বিস্তৃতি লাভ করে; স্পেন হতে সিন্ধু পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড মুসলমানদের

[১] আল-কুরআন, ***সুরা আলে ইমরান***, ৩:৯৫

করতলগত হয়। খাওয়ারেজ ও সমরকন্দ হতে আরম্ভ করে কাবুল ও ফরগনা পর্যন্ত স্থানে তখন ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। কিন্তু তাতে ইসলামের রুহানি বরকতের নাম-গন্ধও ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে যতো উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন তারা প্রত্যেকেই অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু ছিলেন।

সে সময় সম্পর্কে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বলতেন, শাম, ইরাক, কিজায, মিসর এবং আল্লাহর কসম সারা দুনিয়া তখন অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। বিশ্বজুড়ে সেই অত্যাচার-অবিচারের যুগে যদিও শিক্ষা-দীক্ষার দ্বার রুদ্ধ ছিল না, বিভিন্নস্থানে হাদীস-তাফসীরের মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মুহাদ্দিসীন ও ফকীহবৃন্দ শতপ্রকারের বিপদ ও অশান্তি ভোগ করেই শিক্ষা-দীক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন। ফলে সেই বিরাট ভূখণ্ডকে ইসলামের ভাব-ধারায় বিধৌত করে দেওয়া সম্ভবপর হয়নি।

## হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর সৎকার্যকলাপ

হাজ্জাজ হিজরী ৯৫ সালে ইন্তিকাল করেন। সাম্রাজ্যের জন্য এটি একটি সুসংবাদ ছিল। ওয়ালীদও ৯৬ হিজরীতে মারা যান। ওয়ালীদের পরে সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উমাইয়া বংশে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা বলে ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-কে সাম্রাজ্যের পরামর্শদাতারূপে নিযুক্ত করে তিনি মুসলিম জাহানের এক মহাকল্যাণ সাধন এবং মৃত্যুর সময় তিনি লিখিতভাবে অসিয়ত করেন, আমার মৃত্যুর পর ওমর ইবনে আবদুল আযীয সিংহাসনে আরোহণ করবেন।

সুলাইমান ৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অসিয়ত অনুসারে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) সিংহাসনে আসীন হন। তিনি খলীফা হওয়ার পরই অবিলম্বে মরওয়ানী অনুশাসনের রং সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাজ্যময় ন্যায়নিষ্ঠা, ইলম ও আমল এবং সৎকার্যধারা সজীব ও সতেজ হয়ে উঠল। দীর্ঘকাল খুতবাতে হযরত আলী (রাযি.)-এর প্রতি যে লানত বর্ষিত হচ্ছিল তা তিনি রহিত করেন।

উমাইয়া বংশের হাত হতে জায়গীরসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হলো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থানে যেসব অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল অবিলম্বে তাদেরকে পদচ্যুত করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি এমন সুনজর দান করা হয় যে, ঘরে ঘরে এর চর্চা আরম্ভ



হয়। হাদীসসমূহের একত্র সমাবেশের পর প্রদেশসমূহে তার নকল প্রেরণ করা হয়।

হাজ্জাজ ও ওয়ালীদের শাসনকালে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইলম লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি। তাঁর বাপ-দাদা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু সুলাইমানের খিলাফতের জমানায় যখন শিক্ষা-দীক্ষা জনসাধারণের পর্যায়ে বিস্তৃত হল তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অন্তরেও এর জন্য প্রবল বাসনা জেগে ওঠে। ইতোমধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে যে, তাঁর সেই বাসনা কাজে পরিণত করার এক সুবর্ণ-সুযোগ হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন,

مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال: «إلىٰ من تختلف»؟ فقلت: «أختلف إلى السوق، وسميت له أستاذي»، فقال: «لم أعن الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء»، فقلت له: «أنا قليل الاختلاف إليهم»، فقال لي: «لا تفعل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء؛ فإني أرى فيك يقظة وحركة»، قال: «فوقع في قلبي من قوله فتركت الاختلاف إلى السوق، وأخذت في العلم فنفعني الله بقوله».

‘একদিন আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। সে পথে কুফানগরের বিখ্যাত ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা’বী (রহ.)-এর বাড়ি ছিল। যুবক আবু হানিফাকে কোনো তালিবুল ইলম মনে করে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এক সওদাগরের নাম বললেন। ইমাম আমির আশ-শা’বী (রহ.) বললেন, ‘আমি জানতে চাই যে, তুমি কারও কাছে পড়াশোনা কর?’ যুবক আক্ষেপের স্বরে বললেন, ‘আমি কারও কাছে পড়াশোনা করি না।’ ইমাম আমির আশ-শা’বী (রহ.) বললেন, ‘তোমার চেহারায় আমি উপযুক্ততার দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি। আলেমদের খেদমতে তোমার যাতায়াত একান্তই বাঞ্ছনীয়।’’[১]

[১] আল-মুওয়াফ্ফিক আল-মাক্কী, *মানাকিবুল ইমাম আল-আ’যম আবী হানীফা*, পৃ. ৫৪

এই কয়েকটি মাত্র শব্দ যুবকের দেহমনকে আন্দোলিত করে। ইলম শিক্ষার জন্য তিনি পাগল প্রায় হয়ে ওঠলেন। সাহিত্য, কুলজীবিদ্য, ইলমে ফিকহ, আরব-ইতিহাস, হাদীস ও কালাম ইত্যাদি তখন শিক্ষার অঙ্গ ছিল। ইলমুল কালামে তখনও দর্শনের ছায়া নিপতিত হয়নি। সময়োপযোগী দূরদৃষ্টি, উদার ও মহৎ চিন্তা-ধারার তাতে প্রচুর অভাব ছিল। ইসলাম যতোদিন আরব-সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল ততোদিন পর্যন্ত তা বড় সহজ-সরল ছিল। কিন্তু পারস্য, মিসর ও শাম দেশের মাটির সংস্পর্শে গিয়ে তা বহু রঙের সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়ে এবং দর্শনের বেড়াজালে নিপতিত বহু ভ্রান্ত ধারণা লোকসমাজে প্রচারিত হলো। প্রত্যেক বস্তুকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সতর্কতার সাথে দেখা মানুষের একটা স্বভাব-ধর্ম প্রায় হয়ে উঠল।

## ইলমে কালাম

আল্লাহর জাত-সিফাত ও আদি-অন্ত ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন পাকে যা কিছু বর্ণনা রয়েছে আরবে তা মোটামুটিভাবে আলোচিত হতো এবং দৃঢ়বিশ্বাসের জন্য তা-ই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইসলাম পারস্য ও শামের মাটিতে পৌঁছার পর এ সম্পর্কে বহু সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এসবের সমাধানকল্পে বহু দল মেতে ওঠল। তাদের মধ্যে এমন বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয় যে, সত্যভক্ত হলে এসব বিষয়ের জবাব দেওয়ারও বেহুদা মনে করলেন। তবে পথভ্রান্তদেরকে পরিচালিত করার বাসনায় তাঁদেরকে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়েছিল। এভাবেই ইলমে কলামের (তর্কশাস্ত্রের) উদ্ভব হয়। ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) ও ইমাম আবুল মনসুর আল-মাতুরীদী (রহ.) প্রমুখ বিখ্যাত ইমামগণ এ সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করেন।

## ইলমে কালামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত

ইলমে কালামে পরবর্তী জীবনে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বিশেষ একটি বিষয়ে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও এটি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন করার জন্য শুধু স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা ও ধর্মীয় জ্ঞান-গরিমাকে যথেষ্ট মনে করা হতো। স্বভাবগতভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এসব গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁর শরীরে ইরানি রক্ত প্রবাহিত ছিল। আর তিনি কঠোর পরিশ্রমী ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধর্মীয় বিবরণ ও মাসআলা কুফায় এমন বহুল প্রচার হয়েছিল



যে, যেকোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে আলেমের দরবারে ওঠা-বসা ও যাতায়াত করেই তা লাভ করা সম্ভবপর হতো।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও সে বিষয়ে এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে, নামজাদা পণ্ডিতকুল তাঁকে এ বিষয়ে অগ্রনায়ক বলে মান্য করতেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায়ই তিনি বাসরা যেতেন। বাসরা তখন বিভিন্ন মতাবলম্বীদের কেন্দ্র ছিল। খারিজিদেরও এটা বিশেষ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু প্রত্যেক মতাবলম্বীরাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা করে সন্তুষ্ট হতেন। তাদের সবাইকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। পরিশেষে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সবকিছু পরিত্যাগ করে বিশেষভাবে ফিকহশাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দিলেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি এ সাধনায় অতিবাহিত করেন।

## ফিকহ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

প্রথম জীবনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহশাস্ত্র সম্পর্কে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই মনোভাবের পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। তিনি স্বয়ং বলছেন,

> وكنت أعد الكلام أفضل العلوم، وكنت أقول هذا الكلام في أصل الدين، فراجعت نفسي بعد ما مضى لي فيه عمر، وتدبرت فقلت: إن المتقدمين من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وأتباعهم لم يكونوا يفوتهم شيء مما ندركه نحن، وكانوا عليه أقدر، وبه أعرف، وأعلم بحقائق الأمور.
>
> 'প্রথম জীবনে ইলমে কালামকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানতাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আকিদা ও ধর্মের ভিত্তি এর ওপরই নির্ভর করে। কিন্তু পরিশেষে আমার ধারণা হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম এসব আলাপ-আলোচনা হতে সর্বদা পৃথক থাকতেন। অথচ এসবের হাকীকত তাঁদের চেয়ে অধিক কেউই অবগত ছিলেন না।'[১]

আর যেসব লোক ইলমে কালাম নিয়ে মশগুল থাকেন তাঁদের জীবনধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর মন অধিক পীড়িত হয়ে ওঠল। চারিত্রিক

[১] আল-মুওয়াফ্ফিক আল-মাক্কী, *মানাকিবুল ইমাম আল-আ'যম আবী হানীফা*, পৃ. ৫৪–৫৫

পবিত্রতা ও রুহানি গুণাবলির দিক দিয়ে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সাথে তাঁদের কোনো তুলনাই হতে পারে না। তিনি বহু পীর-মুরশিদ ও বুযুর্গ ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেন। তিনি কতিপয় সাহাবায়ে কেরামেরও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর সাথে তাঁর সুগভীর প্রণয় ছিল। তিনি হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহ.), হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.), হযরত বিশার আল-হাফী (রহ.) ও হযরত দাউদ আত-তায়ী (রহ.) প্রমুখের উস্তাদ ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওযা মুবারক যিয়ারতে গিয়ে বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম ইয়া সাইয়িদাল মুরসালীন।' তখনই জবাব আসল, 'ওয়াআলাইকুম সালাম ইয়া ইমামাল মুসলিমীন।'

## উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও বুযুর্গি

তিনি কুফানগরের বিখ্যাত ইমাম ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন। এছাড়াও বহু বিখ্যাত তাবিয়ীদের ফয়েয ও সাহচর্য লাভে তিনি উপকৃত হন। কুফানগরে তাঁর মাদরাসা স্থাপিত ছিল। তখনকার দিনে তা-ই জনসাধরণের শিক্ষাকেন্দ্র মনে করা হতো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে ফিকহশাস্ত্রের ক্রমধারা চলে এসেছে এখানে। হযরত হাম্মাদ (রহ.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সম্পদশালী লোক ছিলেন। সমাজ ও জাতির খেদমত করার তাঁর যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ছিল। কাজেই গভীর মনোযোগ ও পরম শান্তির সাথে তিনি কর্তব্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে ইলমে ফিকহ পড়াতে আরম্ভ করেন।

তখনকার শিক্ষাধারা ছিল উস্তাদ কোনো বিষয়ে সম্পর্কে মৌখিক আলাপ-আলোচনা করতেন, শাগরিদরা তা স্মরণে রাখত। আর কখনো কখনো লিখে নিত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রথমদিন বাম পাশের কাতারে বসেন, নবাগতদের জন্য এটিই নিয়ম ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উস্তাদ যখন বুঝতে পারলেন যে, স্মৃতি-শক্তি ও মেধার দিক দিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর মাদরাসায় অদ্বিতীয় তখন তাঁকে সকলের সম্মুখে আসন গ্রহণ করতে আদেশ দেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, 'আমি দশ বছর পর্যন্ত হযরত হাম্মাদ (রহ.)-এর মাদরাসায় তা'লীম গ্রহণ করি। তারপর ধারণা হলো, আমি



নিজেই শিক্ষাদান আরম্ভ করব। কিন্তু তাঁদের প্রতি সম্মানার্থে আমি তা হতে বিরত রইলাম।'

বাসরায় হযরত হাম্মাদ (রহ.)-এর এক আত্মীয় ছিলেন। সেই আত্মীয় ইন্তিকাল করলে অগত্যা তাঁকে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে হলো। সুতরাং তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। তখন হতে ছাত্রবৃন্দ ও দেশবাসী তাঁর কাছে জড়ো হতে লাগলেন।

এমন সব প্রশ্নও আসতে লাগল যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উস্তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোনো কিছুই জানেননি। তখন তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে সেসবের উত্তর দিতে লাগলেন। আর স্মরণ রাখার জন্য তিনি তা লিখে রাখলেন। দুই-তিন মাস পরে উস্তাদ বাসরা হতে ফিরলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সেসব প্রশ্ন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতেন। এর মধ্যে প্রায়গুলো শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হতো। তাতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রতিজ্ঞা করলেন যে, উস্তাদ যতোদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবেন ততোদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে সুগভীর সম্পর্ক রাখবেন।

ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-এর ইন্তিকালের সময় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যদিও অন্যান্য বুযুর্গদের খেদমতে থেকেও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন তবুও এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রধাণত হযরত হাম্মাদ (রহ.)-এর কাছেই বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করেন। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁকে সর্বাধিক ভক্তি করতেন।[১]

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হাদীস শিক্ষা

হযরত হাম্মাদ (রহ.)-এর জমানাতেই হাদীসের প্রতি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কেননা ফিকহ সংক্রান্ত মাসায়িল সম্পর্কে মুজতাহিদসুলভ তাহকীক তখন তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর হাদীস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে তা সম্ভবপর নয়। তখন সমগ্র মুসলিম জাহানে হাদীস-চর্চা বড় জোরেশোরে আরম্ভ হয়। আর প্রতিটি রাজ্যে সনদ ও রিওয়ায়াতের দফতর খোলা হয়েছিল। তখনও সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা দশ হাজারের মতো ছিল। তাঁরা মুসলিম জাহানের সর্বত্র বিরাজ করছিলেন। কাজেই তাঁদের কল্যাণে সারা দেশব্যাপী সনদ ও রিওয়ায়াতের এক মহাশক্তিশালী ধারা প্রবাহিত হয়।

---

[১] আল-খতীবুল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৩–৩৩৪

লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের কোনো সন্ধান পাওয়ামাত্রই তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাল অবস্থা শোনার জন্য বা শরীয়ত সম্পর্কিত মাসআলার তাহকীক করবার মানসে চারদিকে হতে ঝুঁকে পড়ত। সাহাবায়ে কেরামের শাগরিদকে তাবিয়ীন বলা হতো। তাঁদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। এভাবে তাবিয়ীন বিপুল সংখ্যায় মুসলিম রাজ্যসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। যেসব শহরে অধিকসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বা তাবিয়ীন সমবেত হতেন তাই শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হতো। এর মধ্যে মক্কা মুয়ায্যমা, মদীনা শরীফ, বাসরা ও কুফা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানেই বসবাস করেন। ইসলামি সভ্যতা ও ইসলাম-বিস্তারের এটিই ছিল অন্যতম ভিত্তিভূমি। আরবের অপরিসর ভূখণ্ড আরবদের ক্রমোন্নতির জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) পারস্য-বিজয় সম্পন্ন করার পর যখন ময়দানে অবস্থান করছিলেন তখন প্রয়োজনের তাগিদে হযরত ওমর (রাযি.) তাঁকে চিঠি লিখেন, মুসলমানদের হিজরত স্থান এবং বসবাসের জন্য একটি শহরের ভিত্তি পত্তন করতে। হযরত সা'দ (রাযি.) এজন্য কুফার জমিনকে পছন্দ করেন। আঠার হিজরীতে এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। তখন সেখানে সাধারণ ধরনের ঘর-বাড়ি প্রস্তুত করা হয়।

আরবগণ চারদিক হতে সেখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। এভাবে অল্পদিনের মধ্যে এটি আরবের একটি বিশিষ্ট অংশে পরিণত হয়। কুফা শহরকে সমাগত লোকের বসবাসের উপযুক্ত করার জন্য অসংখ্য লোক নিয়োজিত করা হয়। অল্পদিনের মধ্যে কুফা এমন জনবহুল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত শহরে পরিণত হয় যে হযরত ফারুকে আযম (রাযি.) সেটিকে 'আল্লাহর রহমত' ও ঈমানের ভাণ্ডার' বলে আখ্যায়িত করলেন।

তিনি চিঠিপত্রে কুফাকে খিলাফতের কেন্দ্ররূপে সাব্যস্ত করেছিলেন। পনের হাজারেরও অধিক সাহাবায়ে কেরাম সেখানে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের মধ্যে এমন চব্বিশজন সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন যাঁরা বদরের যুদ্ধে বিশ্বনবীর সাহায্যকারী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সেসব বুযুর্গ ব্যক্তির কল্যাণে সবর্ত্র হাদীস ও রিওয়ায়াতের চর্চা আরম্ভ হয়ে যায়। এভাবে কুফা নগরীর প্রতিটি ঘর-বাড়ি হাদীস ও রিওয়ায়াতের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।



## বাসরা

হযরত ফারুক আযম (রাযি.)-এর আদেশক্রমেই বাসরারও ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ইলমের প্রসারতা ও হাদীস প্রচারের দিক দিয়ে তা কুফার সমকক্ষ ছিল। মক্কা ও মদীনার ন্যায় কুফা ও বাসরা ইসলামের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

হযরত মসরূক ইবনুল আজদা' আল-কুফী (রহ.), হযরত ওবাইদা ইবনে আমর আল-কুফী (রহ.), হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আল-বাসারী (রহ.), হযরত রাবী' ইবনে খাইসাম আল-কুফী (রহ.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা আল-কুফী (রহ.), হযরত আবু আবদুর রহমান আল-আসলামী (রহ.), হযরত কাযী শুরাইহ ইবনুল হারিস আল-কিন্দী (রহ.), হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (রহ.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাল্লাম আল-বাসারী (রহ.) ও হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.) প্রমুখ মহাত্মগণ কুফা ও বাসরা শহরে বসবাস করেন।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) প্রায়ই বলতেন, বিশ্ব-কেন্দ্র হিসেবে মক্কা শরীফ, কিরাআতের জন্য মদীনা এবং হালাল ও হারামের নিমিত্ত কুফা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফিকহশাস্ত্রের জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত হাম্মাদ (রহ.)-এর মজলিসকে যথেষ্ট মনে করতেন। কিন্তু হাদীসের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। সেখানে শুধু মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কাজ চলে না। সেখানে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রিওয়ায়াতের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

## ইলমে হাদীস, রিওয়ায়াত ও সূক্ষদর্শিতার মাসআলা

তখনকার দিনে হাদীস-সংগ্রহ ও সংকলন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। এমনকি সুবিখ্যাত উস্তাদগণও দুই-চারশত হাদীসের চেয়ে অধিক হাদীস মুখস্থ রাখতেন না। জরুরি মাসায়িলের মীমাংসার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া রিওয়ায়াতের ব্যাপারে এমন মতবিরোধ দেখা দিত যে, একটি হাদীস যতোক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে শোনা না যেত ততোক্ষণ এর অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ত।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও এটি মনে মনে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি হাদীসের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করতেন। এজন্য কুফানগরে এমন কম মুহাদ্দিস ছিলেন যাঁর দরবারে ইমাম

আবু হানিফা (রহ.) নতজানু হয়ে বসেননি। এভাবেই তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করেন।

ইমাম আবুল মাহাসিন আশ-শাফিয়ী (রহ.) হাদীস-বিশারদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন যে, তাঁদের মধ্যে নিরানব্বইজন কুফাবাসী ছিলেন। যাদের মধ্যে ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.), ইমাম সালামা ইবনে কুহাইল আল-হাযরামী (রহ.), ফকীহ মুহারিব ইবনে দিসার আস-সাদুসী (রহ.), হাফিয আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী (রহ.), হাফিয সিমাক ইবনে হারব আয-যুহলী (রহ.), ইমাম আমর ইবনে মুররা আল-মুরাদী (রহ.), ইমাম সুলাইমান আল-আ'মাশ আল-কাহিলী (রহ.), ইমাম আদী ইবনে সাবিত আল-আনসারী (রহ.), ইমাম আতা ইবনুস সায়িব আস-সাকাফী (রহ.), হযরত মুসা ইবনে আবু আয়িশা আল-হামদানী (রহ.) ও ইমাম আলকামা ইবনে মারসাদ আল-হাযরামী (রহ.) সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস সনদ ও রিওয়ায়াতের সাধারণ কেন্দ্র ছিলেন।

## ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.)

তিনিই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করেন। তিনি বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেন। কথা আছে যে, তিনি পাঁচশত সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছিলেন। আরব, ইরাক ও সিরিয়ায় যে চার ব্যক্তি চরম শিক্ষাগুরু বলে আখ্যা পেয়েছিলেন ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) তাঁদের মধ্যে একজন।

ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) বলতেন, 'মাত্র চারজন আলেম রয়েছেন, মদীনায় ইমাম সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.), বাসরায় ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.), সিরিয়ায় হযরত মাকহূল ইবনে রাশিদ আশ-শামী (রহ.) ও কুফায় ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.)।'

ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) সুদীর্ঘ সময় কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধনী-দরিদ্র আপামর জনতা তাঁকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। তিনি হিজরী ১০৪ অথবা ১০৬ সালে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম সালামা ইবনে কুহাইল আল-হাযরামী (রহ.) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাবিয়ী ছিলেন। হযরত জুনদব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রাযি.), হযরত আবুত তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা আল-লাইসী (রাযি.) ও অপরাপর বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেছিলেন। ইমাম সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা (ইমাম শাফিয়ীর উস্তাদ)



বলেন, ইমাম সালামা ইবনে কুহাইল আল-হাযরামী (রহ.) বিশিষ্ট লোক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

## হাফিয সিমাক ইবনে হারব আয-যুহলী (রহ.)

তিনি তাবিয়ী ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বলেন, 'সিমাক (রহ.) কখনও হাদীসে ভুল করেনি।' হাফিয সিমাক ইবনে হারব আয-যুহলী (রহ.) স্বয়ং বলেছেন, 'আমি আশিজন সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হয়েছিলাম।'

## ফকীহ মুহারিব ইবনে দিসার আস-সাদুসী (রহ.)

তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বলতেন, 'মুহারিবের চেয়ে অধিক বৈরাগ্য আমি আর কারও মধ্যে দেখিনি।'

তিনি কুফার কাজী-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ও ইমাম ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন মহামান্য পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন।

## ইমামে হাদীস হিশাম ইবনে আরওয়া আল-আসাদী (রহ.)

তিনি মহাসম্মানিত এবং বিখ্যাত তাবিয়ী ছিলেন। তিনি বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.), ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) ও ইমাম সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা তাঁর শাগরেদ ছিলেন।

খলীফা মনসুর তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন। একসময় তিনি তাঁকে লক্ষ দিরহাম দান করেন। খলীফা স্বয়ং তাঁর জানাযার নামায পড়েন। ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) লিখেছেন যে, 'তিনি বিশ্বাসযোগ্য এবং তিনি বহু হাদীস জানতেন।'[১] ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.) তাঁকে হাদীসের ইমাম বলে স্বীকার করেছেন।

## ইমাম সুলাইমান ইবনে মাহরান আল-আ'মাশ (রহ.)

তিনি বেশি কাঁদতেন, তিনি কুফার বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁর সাথে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রহ.)-এর সাক্ষাৎ

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৯, পৃ. ৩২৩, ক্রমিক: ৪২৮০

হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) হতে তিনি হাদীস শোনেন। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) ও ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-আযদী (রহ.) তাঁর ছাত্র ছিলেন। বাসরায়ও তিনি হাদীস সংকলন করেন, সেখানে ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.) ও হাফিয কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহ.)-এর ফয়েয লাভে তিনি উপকৃত হন।

### মুহাদ্দিস ও তাবিয়ীরূপে হাফিয কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহ.)

তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাবিয়ী ছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস আল-মুযানী (রাযি.), হযরত আবুত তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা আল-লাইসী (রাযি.) ও অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, মদীনায় এক উস্তাদের কাছে হাফিয কাতাদা (রহ.) ফিকহ ও হাদীস পড়তেন। একদিন উস্তাদ বললেন, 'তুমি প্রতিদিনই বহু কথা জিজ্ঞাসা করে থাক। সেসবের কিছু তোমার স্মরণ আছে কি?' তিনি বললেন, 'প্রতিটি অক্ষর আমার স্মরণ রয়েছে।' তারপর যা কিছু শুনেছিলেন তা সমুদয় দিন তারিখসহ বলে যেতে লাগলেন। উস্তাদ তখন অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'জানতাম না যে, আল্লাহ তোমার মতো লোকও দুনিয়ায় পয়দা করেছেন।' তারপর হতে তিনি লোকসমাজে স্মরণকারীরূপে অভিহিত হতেন।

### হাদীসে আমীরুল মুমিনীনরূপে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-আযদী (রহ.)

তিনি ছিলেন অতিউচ্চশ্রেণির মুহাদ্দিস। তাঁর দু'হাজার হাদীস মুখস্থ ছিল। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) তাঁকে হাদীস সম্পর্কে মুমিনদের আমীর বলে মান্য করতেন। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন,

لَوْلَا شُعْبَةُ، لَمَا عُرِفَ الْحَدِيْثُ بِالْعِرَاقِ.

'ইমাম শু'বা (রহ.) না হলে ইরাকে হাদীসের চর্চা হতো না।'[১]

তিনি ১৬০ হিজরীতেই ইন্তিকাল করেন। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-এর কাছে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, 'আজ হতে হাদীসশাস্ত্রেরও মৃত্যু হয়েছে।'

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৭, পৃ. ২০৬, ক্রমিক: ৮০



ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সঙ্গে হযরত ইমাম শু'বা (রহ.)-এর সুগভীর সৌহার্দ ছিল। ইমাম শু'বা (রহ.) একদিন আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসঙ্গক্রমে বলেন, 'সূর্য দীপ্তমান, আমি তা যতোখানি সত্যরূপে জানি, আমি ততোখানি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, ইলম ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সমদীপ্তিমান।'

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহ.)-কে কেউ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'এটিই তাঁর উপযুক্ততার যথেষ্ট।'

### ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মক্কা-মদীনা ভ্রমণ

যদিও ছাত্র-জীবনেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস শরীফের অমূল্য মূলধন লাভ করেছিলেন, তবুও এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করার মানসে তাঁর পক্ষে মক্কা-মদীনা ভ্রমণ জরুরি ছিল। মক্কা-মদীনাকে হারামাইন বলা হতো। হারামাইন তখন ধর্মীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কোন সালে প্রথম সেখানে ভ্রমণ করেন তা ইতিহাসে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও প্রবল বিশ্বাস এই যে, তিনি যখন প্রথম ভ্রমণে বের হন তখন তাঁর পাঠ্যাবস্থা ছিল।

ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকান (রহ.) লিখেছেন যে,

عن وكيع قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أخطأت في خمسة أبواب في المناسك بمكة فعلمنيها حجام، وذلك إني أردت أن أحلق رأسي، فقال لي: أعربي أنت قلت: نعم، وكنت قد قلت له: بكم تحلق رأسي فقال: النسك لا يشارط فيه، اجلس، فجلست منحرفاً عن القبلة، فأومأ لي باستقبال القبلة، وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر، فقال: أدر شقك الأيمن من رأسك، فأدرته، وجعل يحلق رأسي وأنا ساكت فقال لي: كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب فقال: أين تريد قلت: رحلي فقال: صلي ركعتين وامض، فقلت: ما ينبغي أن يكون هذا من مثل هذا

الحجام إلا ومعه علم، فقلت: من أين لك ما رأيتك أمرتني به فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا.

'ইমাম ওয়াকী' ইনুল জার্‌রাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, 'আমি হজের সময় চুল কাটাতে গিয়ে এক নাপিতের কাছে জব্দ হয়েছিলাম। চুল কাটাতে কত লাগবে জানতে চাইলে সে বলল, হাজীদের কাছ থেকে দাম চুকিয়ে নেওয়া হয় না। আমি তখন চুপ হয়ে মাথার চুল কাটাতে লাগলাম। সে আমাকে আমার ভুল দেখিয়ে বলল, হজের সময় চুপ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, তাকবীর বলা চাই। চুল কাটা শেষ করে আমি বাড়ির দিকে রওয়ানা হলে, সে বলল, প্রথমে দু'রাকআত নামায পড়ে নেবে। তারপর অন্য কোথাও যাবেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, তুমি এসব মাসআলা কার কাছে শিখেছো? সে বলল, ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ আল-কুরাশী (রহ.)-এর ফয়েয হতে আমি এসব শিক্ষা লাভ করেছি।''[১]

## ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ আল-কুরাশী (রহ.)-এর শিক্ষা-মজলিস

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে সময় পবিত্র মক্কায় পৌঁছেন, তখন শিক্ষাদান ও শিক্ষা অত্যন্ত জোরেশোরে চলছিল। হাদীস সম্পর্কে যাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং যাঁদের অধিকাংশই সাহাবায়ে কেরামের সাহচর্য লাভে উপকৃত হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্নভিন্ন শিক্ষা-মজলিস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ আল-কুরাশী (রহ.)-এর শিক্ষা-মজলিস সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

তিনি একজন বিখ্যাত তাবিয়ী ছিলেন। প্রায়ই তিনি সাহাবায়ে কেরামের খেদমতে থাকতেন। আর তাঁদের সাহচর্যের ফয়েয হতে তিনি ইজতিহাদের উপযুক্ততা লাভ করেছিলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযি.), হযরত আসমা ইবনে যায়েদ (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আদুল্লাহ (রাযি.), হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুস

[১] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৩, পৃ. ২৬১–২৬২, ক্রমিক: ৪১৯



সায়িব (রাযি.), হযরত রাফি ইবনে খাদীজ (রাযি.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)সহ বহু সাহাবা হাদীস শোনেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন,

أَدْرَكْتُ مائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এমন দু'শত বুযুর্গের সঙ্গলাভ আমার ভাগ্যে ঘটেছিল।'[১]

হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বলতেন, আতা ইবনে আবু রাবাহ বর্তমান থাকতে লোকেরা আমার মজলিসে আসে কেন? হজের জমানায় সর্বদাই সরকারের পক্ষ হতে ঘোষণাবাণী প্রচার করা হতো যে, আতা ব্যতীত অপর কারও ফাতওয়া দেওয়ার অধিকার নেই। ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) ও ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) তাঁর থেকে শিক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁর খেদমতে পৌঁছলেন তখন পরীক্ষামূলকভাবে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তাতে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করতে অনুমতি দান করলেন। তাঁর আদব-কায়দা, আমল-আখলাক, স্মৃতি ও মেধার পরিচয় পেয়ে শাগরেদের প্রতি উস্তাদের প্রীতি-ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে ব্যাপার এমন দাঁড়াল যে, তিনি যখন ক্লাসে যেতেন তখন উস্তাদ অপরাপরকে দূরে সরিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে নিজের কাছে বসাতেন।

ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ.) হিজরী ১৫৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখনই মক্কা শরীফ যেতেন, সুযোগ হলেই ইমাম আতা (রহ.)-এর খেদমতে সময় কাটাতেন।

## হাফিয আবু আবদুল্লাহ ইকরামা (রহ.)

ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ.) ব্যতীত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মক্কা শরীফে যেসব মুহাদ্দিসীনের কাছ হতে হাদীসের সনদ লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হাফিয ইকরামা (রহ.) অন্যতম। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর গোলাম ও শাগরেদ ছিলেন। উস্তাদ বিশেষ মনোযোগের সাথে তাঁকে আদব-কায়দাও শিক্ষা দান করেন। এমনকি উস্তাদের জীবিত

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৮১, ক্রমিক: ২৯

অবস্থাতেই হাফিয ইকরামা (রহ.) ইজতিহাদ ও ফাতওয়াদানের যোগ্যতা অর্জন করেন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত উকবা ইবনে আমির (রাযি.), হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) প্রমুখ থেকে হাফিয ইকরামা (রাযি.) হাদীস শিক্ষা করেন এবং ফিকহ সম্পর্কিত মাসায়িলের তাহকীক করেন। প্রায় সত্তরজন তাবিয়ীন তাঁর থেকে হাদীস ও তফসীর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) বলেন,

مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْ عِكْرِمَةَ.

'বর্তমান জমানায় হাফিয ইকরামা (রহ.) হতে অধিক কুরআন অবগত আর কেউ নেই।'[১]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) তাবিয়ীদের সরদার ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুনিয়ায় আপনার চেয়ে বড় আলেম কেউ আছেন কি? জবাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ইকরামা আমার চেয়ে বড় আলেম।'[২]

## সাত ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম

হিজরী সালের প্রথমভাগে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মদীনা রওয়ানা হন। মদীনা তখন হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। আর এটি ছিল বিশ্বনবী (সা.)-এর শেষ আবাসভূমি। সাহাবায়ে কেরামের পর তাবিয়ীদের মধ্যে সাত ব্যক্তি ইলমে ফিকহ ও হাদীস সম্পর্কে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শরীয়তের মাসায়িল সম্পর্কে লোকেরা তাঁদের ওপরই অধিক নির্ভর করত। সেসব তাবিয়ী বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরামের সাহচর্যে থেকে তাঁদের ফয়েয হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁরা এমন মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতিতে সারা রাজ্যময় শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁরা প্রায় সকলেই সমকক্ষ লোক ছিলেন এবং তাঁদের সম্মিলিত মজলিসের মারফত সমগ্র শরীয়তী মাসআলার মীমাংসা হতো।

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৭, ক্রমিক: ৯
[২] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৬, ক্রমিক: ৯



ইমাম মালিক (রহ.) মদীনার ফিকহশাস্ত্রের নেতা ছিলেন। তিনি এ সম্মিলিত দলের ফাতওয়া অনুযায়ী সব কিছু মীমাংসা করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন তাবিয়ীদের মধ্যে অন্যতম দু'জন ছিলেন সুলাইমান ইয়াসার (রহ.) ও হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)।

হযরত সুলাইমান (রহ.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী হযরত মাইমুনা (রাযি.)-এর গোলাম। হযরত সালিম (রহ.) ছিলেন ফারুকে আযম হযরত ওমর (রাযি.)-এর পৌত্র। তিনি তাঁর বংশধরদের কাছ হতে শিক্ষালাভ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উভয় বুযুর্গের খেদমতে উপস্থিত হলেন। তাঁর থেকে তিনি বহু হাদীস শুনতে পান।

যদিও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিক্ষাপ্রচেষ্টা মদীনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও তাঁর জ্ঞান-স্পৃহা আজীবন সতেজ ছিল। তিনি প্রায়ই মক্কা-মদীনায় যাতায়াত করতেন। আর কিছুকাল সেখানে অবস্থানও করতেন। হজের মৌসুমে ইসলামি রাজ্যসমূহ হতে বিখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি মক্কায় এসে সমবেত হতেন। তাতে মুসলিম জাহানের শত প্রকার মঙ্গল সাধিত হতো। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রায়ই সেসব সম্মেলনে যোগদান করেও উপকৃত হতেন।

## হাদীসের সনদ লাভ

ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) ও হযরত মাকহূল ইবনে রাশিদ আশ-শামী (রহ.)-কে শাম দেশের ধর্মীয় ইমাম বলা হতো। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মক্কা শরীফেই তাঁদের পরিচয় লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর কাছ হতে শিক্ষালাভ করেন এবং হাদীসের সনদ প্রাপ্ত হন। এর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি এবং ইজতিহাদরে সুনাম দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম জাহানে তখন তাঁর সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। সে যুগে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) নামে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একজন নামজাদা ছাত্র শাম দেশে ভ্রমণে বের হন। তাঁর কাছে ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কুফায় আবু হানিফা নামে কে নাকি জন্মগ্রহণ করেছেন যে, ধর্ম সম্পর্কে তিনি নতুন নতুন কথা বলে থাকেন!

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর কোনো উত্তর না দিয়ে বাড়ি চলে আসেন। দুই-তিন দিন পরে যখন তিনি আবার ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.)-এর খেদমতে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিছু কাগজের টুকরা নিয়ে গেলেন। ইমাম আওযায়ী (রহ.) তাঁর হাত হতে সেই টুকরাখানা নিজ হাতে নিলেন। শিরোনামার ওপর লেখা ছিল, 'নুমান ইবনে সাবিত বলেছেন।' বেশকিছু সময় পর্যন্ত তিনি বিশেষ মনোযোগের সাথে তা দেখলেন। তারপর ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নুমান কোন বুযুর্গ? তিনি বললেন, তিনি ইরাকের অধিবাসী। আমি তাঁর খেদমতেই কালাতিপাত করে থাকি।

ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) বললেন, মনে হয় তিনি একজ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) আরজ করলেন, তিনি সেই আবু হানিফা যাঁকে আপনি একদিন প্রবঞ্চক জ্ঞান করেছিলেন। ইমাম আওযায়ী (রহ.) তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন। হজের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি মক্কা শরীফে গমন করলেন। ঘটনাক্রমে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

তাঁদের মধ্যে কোনো এক মাসআলা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখন এমন তাত্ত্বিক আলোচনা করলেন যে, ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) মোহিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করার পর ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এমনই একজন উপযুক্ত লোক যে, তাঁকে দেখে লোকের ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর সম্পর্কে আমার ভ্রান্ত ধারণার জন্য আমি বিশেষভাবে দুঃখিত।

## ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ও ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর সাথেও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এক অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। ইমাম আযম (রহ.) একদিন মদীনায় গেলেন। তিনি ইমাম বাকির (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। ইমাম আযম (রহ.)-এর এক সাথী তাঁর পরিচয় দান করলে ইমাম বাকির (রহ.) বললেন, শুনেছি, আপনি কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে আমার বাপ-দাদার হাদীসের বিরোধিতা করে থাকেন।



ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বিনীতভাবে বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয়ে চলছি। হাদীসের বিরোধিতা করার অধিকার কারও নেই। আপনার অনুমতি পেলে, আমি আমার বক্তব্য পেশ করব। তারপর তাঁদের মধ্যে রীতিমতো আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো।

**ইমাম আযম (রহ.)** : স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কে দুর্বল?

**ইমাম বাকির (রহ.)** : স্ত্রীলোক।

**ইমাম আযম (রহ.)** : ভাগ-বণ্টনে পুরুষের হক অধিক না স্ত্রীলোকের?

**ইমাম বাকির (রহ.)** : পুরুষের।

**ইমাম আযম (রহ.)** : আমি যদি কিয়াসের ওপর ভিত্তি করতাম, তবে বলতাম যে, স্ত্রীলোককে অধিক অংশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা বাহ্যিক কিয়াসের ওপর গুরুত্ব দিলে দুর্বলকে অধিক অংশ দেওয়া সমুচিত। তারপর আরজ করলেন, আচ্ছা, নামায শ্রেষ্ঠ, না রোযা?

**ইমাম বাকির (রহ.)** : নামায।

**ইমাম আযম (রহ.)** : এদিক দিয়ে দেখতে গেলে হায়েযওয়ালী স্ত্রীলোকের রোযার কাযা ওয়াজিব না হয়ে নামাযের কাযা ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ আমি রোযার কাযা করার ফাতওয়া দিয়ে থাকি।

এসব আলাপ-আলোচনায় ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) এমন সন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি স্বীয় আসন হতে ওঠে এসে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর কপাল চুম্বন করলেন। ইমাম আযম (রহ.)ও উপকার লাভ করার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘকাল ইমাম বাকির (রহ.)-এর খেদমতে ছিলেন। তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহ, তাসাউফ ও হাদীস সংক্রান্ত বহু বিষয়ের মীমাংসা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এরও সাহচর্য হতে বিশেষ উপকার লাভ করেন।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পদ-গৌরব

এমন একসময় ছিল যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সামান্য একজন তালিবুল ইলম হিসেবে মক্কা ও মদীনা পরিভ্রমণ করতেন। পরবর্তী জীবনে এমন দিনও এসেছিল যে, তিনি যদি ভ্রমণে হওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন সবর্ত্র শোরগোল পড়ে যেত যে, ইমাম আরব পরিভ্রমণে বের হয়েছেন। তিনি যে বস্তি হয়ে যেতেন সেখানে হাজার হাজার লোকের ভিড় পড়ে যেত।

একদিন মক্কা শরীফে তাঁর মজলিসে তিল পরিমাণ জায়গাও ছিল না। সেখানে ফিকহ ও হাদীস উভয়বিধ লোকের আগমন হয়েছিল। সেখানে শান্তিতে বসা দূরের কথা, দাঁড়ানোর স্থানও পাওয়া যেত না। অবশেষে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অবস্থা বেগতিক দেখে বললেন, কেউ যদি মেজবানের কাছে সকল লোকজনের বসার স্থানের সুবন্দোবস্ত করে দিত!

ইমাম আবু আসিম আন-নাবীল (রহ.) সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, যাচ্ছি। তারপর তিনি কয়েকটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য সেখানে থেমে গেলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখন তাঁকে কাছে ডেকে বিশেষ মনোযোগের সাথে তাঁর প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন। তখন মেজবানের কথা কারও স্মরণ রইল না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম আবু আসিম (রহ.)-কে বিদায়পূর্বক অপর এক ছাত্রের দিকে মনোযোগ দিলেন। পূর্বকথা তিনি সর্ম্পূরূপে ভুলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তা খেয়ালে আসলে তিনি বললেন, কে না জানি মেজবানকে গিয়ে এসব কর্ণগোচর করার ভার গ্রহণ করেছিল? সেই ব্যক্তিটি কোথায়?

ইমাম আবু আসিম আন-নাবীল (রহ.) বললেন, আমি আরজ করেছিলাম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, তবে তুমি যাওনি কেন? ইমাম আবু আসিম (রহ.) তখন তর্কচ্ছলে বললেন, আমি তো এমন কথা বলিনি যে, আমি এখনই যাচ্ছি। আমার অবসর মতো আমি অবশ্য যাব। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, সাধারণ কথা-বার্তায় সেসব ধারণার অবকাশ নেই। জনসাধারণ এর দ্বারা যে অর্থ বোঝায় তাই গ্রহণ করা উচিত।

এক হিসেবে এটিও ফিকহের মাসআলা ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি কথায় বহুকিছু মীমাংসা হয়ে যেত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উস্তাদবৃন্দও তাঁকে এ ধরনের সম্মানের চোখে দেখতেন যে, লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেত।



ইমার আমর ইবনে দীনার (রহ.) মক্কা শরীফের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকলে তাঁকে ব্যতীত তিনি অপর কাকেও আহ্বান করতেন না।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)

ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর চেয়ে বয়সে তের বছরের ছোট ছিলেন। তবুও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রায়ই তাঁর মজলিসে যোগদান করে হাদীস শুনতেন।

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে* লিখেছেন, ছাত্র যেরূপ আদব-তামীযের সাথে শিক্ষকের সম্মুখে বসে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর সম্মুখে তদ্রূপভাবে বসতেন। অনেকে এটাকে অপমানসূচক বলে মনে করত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা ইলমের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভদ্রতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইমাম মালিক (রহ.)ও ইমাম আযম (রহ.)-কে অধিক ভক্তির চোখে দেখতেন।

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালিক (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক বুযুর্গকে সেখানে আসতে দেখলাম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। তিনি প্রস্থান করলে ইমাম মালিক (রহ.) বললেন, আপনারা কি জানেন, তিনি কে? তিনি ইরাকের মহান ইমাম আবু হানিফা। তিনি ইচ্ছা করলে, এ খুঁটিকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারেন।

কিছুক্ষণ পরে অপর একজন বুযুর্গ ব্যক্তি আসলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর প্রতিও ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। সেই বুযুর্গ ব্যক্তি প্রস্থান করলে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) লোকদের কাছে পরিচয় প্রদান করলেন যে, তিনি ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)।

## হাদীস শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

হিজায ও ইরাকের ইমামগণ হাদীস বর্ণনাকালে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতেন। তখন শিক্ষার ধারাও বিভিন্ন ছিল। অনেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে গুরুত্ব দিতেন না। ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) ও ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) হাদীস মুখস্থ করাকে সনদ মনে করতেন। হাদীস বর্ণনাকালে অর্থ পরিবর্তন না হলে হাদীসের কোনো এক অংশকেও বাদ

দেওয়া তিনি দুরস্ত মনে করতেন। অনেকে এর ঘোর বিরোধিতা করতেন। একদল বলতেন, রাবী সামনে উপস্থিত না থাকা পর্যন্ত তাঁর থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করা যায় না। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর উস্তাদ ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.)ও উক্ত মতাবলম্বী ছিলেন।

অপর একদল পর্দার আড়াল হতে লিখিতভাবে হাদীস বর্ণনা করা দুরস্ত মনে করতেন। ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল হাদীস বর্ণনাকালে শব্দ ও উদ্দেশ্যের তফসীরও বর্ণনা করে যেতেন। অনেক লোক এরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। এক ব্যক্তি ইমাম যুহরী (রহ.)-কে সাবধান করে বলে দিলেন যে, আপনি হাদীসে নববীতে নিজের কথা জুড়ে দেবেন না।

ইমাম মালিক (রহ.) পছন্দ করতেন, ছাত্র পড়ে যাবে আর তিনি তা শুনে যাবেন। কিন্তু সকলে এ নিয়ম পছন্দ করতেন না। এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মজলিস হতে এই বলে চলে গেলেন যে, শিক্ষক নিজে না পড়ে ছাত্র দ্বারা পড়িয়ে থাকেন। এ জাতীয় বহু মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আযম (রহ.) এসব মতবিরোধের অবসানকল্পে বিভিন্ন ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের কাছে যাওয়া-আসা করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যে অবদান রয়েছে তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

## শিক্ষা-ধারার ক্রমোন্নতি

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পক্ষে সুখের বিষয় হচ্ছে, তিনি শিক্ষা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব হতেই হাদীসের শিক্ষা-ধারণা যথারীতি ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়েছিল। এর আগে মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনা করার রীতি ছিল। কোনো কোনো ইমাম হাদীসকে লিপিবদ্ধ করা না-জায়িযের কাছাকাছি মনে করতেন। হিজরী ১০১ সালে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) মদীনাবাসীকে চিঠি লিখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় তা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এজন্য প্রতি শহরে তা ফরমান আকারে প্রচার করা হয়। সুতরাং মদীনায় ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) হাদীস সংগ্রহ আরম্ভ করলেন। এসব লিপিবদ্ধ করে তা নকল কয়েকটি সংখ্যা সরকারিভাবে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রচার করা হয়। তখন হতে হাদীস লিপিবদ্ধ করা একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। আর যেসব স্থানে হাদীস অবগত লোক ছিলেন তাঁদের অনুসন্ধান নিয়ে হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হয়।



ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর উস্তাদ ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনা করার পক্ষপাতী ছিলেন, তবুও হাদীস বর্ণনাকালে তিনি কিতাব সঙ্গে রাখতেন। যখন শিক্ষা-ধারার সর্বাধিক উন্নতি হয় জনসভায় শায়খ এক উচ্চস্থানে আসন গ্রহণ করতেন আর হাদীসের কিতাব তাঁর হাতে থাকত। ছাত্ররা কলম-দোয়াত সহকারে বসে যেত। উস্তাদ যা বলতেন ছাত্রবৃন্দ হুবহু সেসব শব্দে তা লিখে নিত।

শ্রোতার সংখ্যা অধিক হয়ে পড়লে মধ্যবর্তী লোক দাঁড়িয়ে যেতেন। উস্তাদ যা বলতেন তিনিও হুবহু তাই বলে যেতেন। একটি শব্দও যাতে গরমিল না হয় এজন্য কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। কাজেই মধ্যবর্তী লোক নির্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত তাঁর স্মৃতিশক্তি যেন প্রখর এবং সর্ববিষয়ে তিনি যেন পারদর্শী হন। আর তাঁর সুর ও আওয়াজ যেন বুলন্দ হয়।

সর্বদিকে লক্ষ করে ইমাম আদম ইবনে আবু ইয়াস আল-আসকালানী (রহ.) ও ইবনে আতিয়া (রহ.)-কে যথাক্রমে ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর শিক্ষা মজলিসের মধ্যবর্তী লোক নির্বাচন করা হয়।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ অসংখ্য ছিলেন বলে তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। ইমাম আবু হাফস আল-কবীর (রহ.) দাবি করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অন্ততপক্ষে চার হাজার শিক্ষকের কাছ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইসলামের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল।

হাদীস সংগ্রহে মুসলমানগণ যে রকম কঠোর পরিশ্রম ও আপ্রাণ ও চেষ্টা করেছেন দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে তা অনুমান করা কঠিন ব্যাপার। চার হাজার লোকের কাছ হতে হাদীস সংগ্রহ করেছেন, এমন অসংখ্য লোকের নাম আমরা জানি। আর এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, যাঁরা হাজার লোকের কাছে পড়াশোনা করছেন। তাঁদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খদের বিস্তারিত বিবরণ

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মুহাদ্দিসীন যেসব কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাল-অবস্থা ও তাঁর শায়খদের পরিপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করছেন সেসব কিতাব আমাদের হাতে নেই। আর যেসব কিতাব আজকাল পরিদৃষ্ট হয় তাতে এত অসংখ্য লোকের জীবনীর বিবরণ রয়েছে যে, তা হতে কোনো লোকের ব্যক্তিগত হাল-অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া কঠিন ব্যাপার।

*তারিখে বাগদাদ*, *তাহযীবুল কামাল*, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায* ও *আল-মুওয়াত্তা* ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা আমরা পৃথকভাবে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা করেছি। নিম্নে তাঁদের নাম দেওয়া উল্লেখ করা হলো:

মক্কা শরীফে ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ আল-কুরাশী (রহ.), ইমাম আমর ইবনে দীনার আল-জুমাহিয়ী (রহ.), ফকীহ আবদুল আযীয ইবনে রুফাই' আত-তায়িফী (রহ.), ইমাম আবুয যুবাইর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম আল-কুরাশী (রহ.), ইমাম ইসমাঈল ইবনে আদুল মালিক ইবনে আবুস সুফাইরা আল-মক্কী (রহ.) ও ইমাম হারিস ইবনে আবদুর রহমান আল-হামদানী (রহ.) প্রমুখ।

মদীনা শরীফে ছিলেন আতিয়া ইবনে সা'দ আল-আওফী, ইমাম হিশাম ইবনে অরওয়া আল-আসাদী (রহ.), হযরত নাফি' মাওলা ইবনে ওমর (রহ.), ইমাম আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আ'রাজ আল-মাদানী (রহ.), ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হাফস আল-আদাওয়ী (রহ.) ও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে দীনার আল-আদাওয়ী (রহ.) প্রমুখ।

কুফানগরে ছিলেন ইমাম হাকাম ইবনে উতাইবা আল-কিন্দী (রহ.), ইমাম আউন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা আল-হুযালী (রহ.), ইমাম সালামা ইবনে কুহাইল আল-হাযরামী (রহ.), ইমাম যিয়াদ ইবনে ইলাকা আস-সা'লাবী (রহ.), ইমাম সাঈদ ইবনে মাসরূক আস-সাওরী (রহ.), হাফিয আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী (রহ.), মুহারিব ইবনে দিসার আস-সাদুসী (রহ.), ইমাম হাইসাম ইবনে হাবীব আস-সার্‌রাফ (রহ.), ইমাম কাইস ইবনে মুসলিম আল-জাদালী (রহ.), ইয়াযীদ ইবনে সুহাইব আল-ফাকীর (রহ.), হাফিয সিমাক ইবনে হারব আয-যুহলী (রহ.) ও ইমাম সুলাইমান আল-আ'মাশ আল-কাহিলী (রহ.) প্রমুখ।



বাসরায় ছিলেন হাফিয কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহ.), ইমাম আসিম ইবনে সুলাইমান আল-আহওয়াল (রহ.) ও ইমাম শাইবান ইবনে আবদুর রহমান আত-তামীমী (রহ.) প্রমুখ।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তাহকীক ও সতর্কতা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবের তুলনায় অতিসংক্ষিপ্ত। সব শায়খদের নাম উল্লেখ করতে হলে এর কলেবর শতগুণে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অসংখ্য শায়খ থাকা যে রকম গৌরবের বিষয়, এরচেয়ে অধিক গৌরবের বিষয় হচ্ছে, তিনি হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বিশেষভাবে অবগত যে, হাদীস বর্ণনাকালে যতো অধিক মধ্যস্থতা থাকবে ততোই এতে পরিবর্তন ও পরিবন্ধনের আশঙ্কা থাকবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উস্তাদদের প্রায়ই তাবিয়ীদের অন্তর্গত ছিলেন এবং তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত একটিমাত্র মধ্যস্থতা অবলম্বন করতে হয়েছিল বা এমন ব্যক্তি তাঁর উস্তাদ ছিলেন যাঁরা নামজাদা তাবিয়ীদের সাহচর্যে ছিলেন; তাঁদের ইলম ও ফযীলত, আমানতদারি ও পরহেজগারি অতুলনীয় ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিক্ষাধারা সাধারণ শিক্ষার্থী হতে পৃথক ছিল। জীবন প্রভাতেই তিনি তর্ক-বিতর্ক ও ইজতিহাদে ওঠে-পড়ে লেগে যান। আর এ সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে উস্তাদের বিরোধিতা করতেও তিনি পরোয়া করতেন না।

একদিন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথ চলতে চলতে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেলে ইমাম হাম্মাদ (রহ.) তায়াম্মুম করার ফাতওয়া দেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিরোধিতা করে বলেন, নামাযের শেষসময় পর্যন্ত পানির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ঘটনাক্রমে কিছুদূর গিয়েই পানি পাওয়া গেল। তখন সকলে অযু করে নামায আদায় করলেন। সেদিন জীবনের সর্বপ্রথম তিনি শায়খের বিরোধিতা করলেন। আর তাও তাঁর শিক্ষার্থী জীবনের প্রথম পর্যায়ের ঘটনা।

ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) ছিলেন তাঁর উস্তাদ। ইমাম শা'বী (রহ.)-এর রায় ছিল যে, পাপের কোনো কাফ্ফারা দিতে হয়

না। কেননা আল্লাহ তাআলা তালাকের কাফ্ফারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইমাম শা'বী (রহ.)-এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি ক্রোধভরে বললেন, আপনি কি কিয়াস করে বলছেন?

কোনো একব্যক্তি হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ.)-এর কাছে وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ (এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ)[১] আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'হযরত আইয়ুব (আ.)-এর যেসব বংশধর মারা গিয়েছিলেন আল্লাহ তাঁদেরকে জীবিত করে দিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে নতুন লোকও পয়দা করলেন।' ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি কারও ঔরসে জন্ম গ্রহণ না করে তবে সে তার সন্তান হতে পারে না।[২]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জ্ঞানের দিক দিয়ে উন্নতির অপর একটি কারণ হচ্ছে, তাঁর জীবনে বহু কামিল ব্যক্তির সাহচর্য লাভের সুযোগ ঘটেছিল। কুফা, বাসরা, মক্কা ও মদীনা ইত্যাদি যেসব শহরে তাঁর অবস্থান করার সুযোগ লাভ হয়েছিল সেসব স্থানে আলো-বাতাস মাযহাবী আলাপ-আলোচনায় ভরপুর ছিল।

আলেমদের সাথে মিলেমিশে করা এবং ইলমী অনুষ্ঠানে যোগদান করার প্রেরণা তাঁর রক্ত-মাংসের সাথে জড়িত ছিল। তাঁর নামধাম ও যশ-গৌরব দেশ-বিদেশ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি যেখানেই যেতেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভ, উপকারপ্রাপ্তি এবং তর্ক-বিতর্ক করার জন্য শত-সহস্র লোক সমবেত থাকত।

## শিক্ষা মজলিস ও জীবিকা নির্বাহের উস্তাদের প্রতি আদব

ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.) ছিলেন ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর উস্তাদ। উস্তাদের জীবদ্দশায় ছাত্র ইজতিহাদের উপযুক্ততা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বয়সও তখন কম ছিল না। উস্তাদের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল চল্লিশের মতো। তবুও উস্তাদের প্রতি তাঁর এমনই গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল যে, উস্তাদের জীবদ্দশায় তিনি পৃথক দরবার কায়েম করবেন তা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আগে উস্তাদের প্রতি শাগরেদের কি রকম ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল তা অনুমান করাও আজকাল কঠিন ব্যাপার। ইমাম আবু

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৮৪

[২] আস-সায়মারী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী*, পৃ. ৩৬



হানিফা (রহ.) বলছেন, ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.) যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন আমি তাঁর বাড়ির দিকে পা মেলে বসিনি।

হিজরী ১২০ সালে ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.) ইন্তিকাল করেন। ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.)-এর ইন্তিকালের পরে ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-ই ফিকহশাস্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিলেন। ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-এর মৃত্যুতে কুফানগর নিষ্প্রভ হয়ে গেল। ইমাম হাম্মাদ (রহ.) একজন উপযুক্ত পুত্র রেখে ইন্তিকাল করেন।

মানুষের অনুরোধে পুত্রকে তাঁর পিতার আসনে বসতে হলো। কিন্তু তাঁর চরিত্রে কঠোরতার অভাব থাকায় তাঁকে অপসারিত করে ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে সর্বগুণে গুণান্বিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মুসা ইবনে কসীরকে সেই মসনদে সমাসীন করা হয়। ফিকহে যদিও তিনি ততো পারদর্শী ছিলেন না, তবুও তিনি বহু বুযুর্গ ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং এর জন্য লোকেরাও তাঁকে পরম শ্রদ্ধার সাথে দেখত। কাজেই তিনি কিছুদিন শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করলেন। তিনিও হজে চলে গেলে সব বুযুর্গ ব্যক্তি একমত হয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে সেই পদ অলঙ্কৃত করার জন্য অনুরোধ করেন।

ইচ্ছা করলে তার আগেও ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সেই আসনে সমাসীন হতে পারতেন। তবুও সে গুরুভার নিজের কাঁধে বহন করতে তাঁর মন রাজি ছিল না। ইতোমধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একরাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওযা মুবারক হতে হুযুরের হাড়গুলো একত্র জমা করছেন এবং এক হাড় হতে অন্য হাড় পৃথক করে রাখছেন। তিনি ভীত-কম্পিত হৃদয়ে জাগরিত হলেন। তারপর তিনি জনৈক স্বপ্নবিশারদের কাছে এর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

সেই ব্যক্তি বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইলম, ফিকহ ও সুন্নত বিষয়ে এমন উন্নতি লাভ করবেন যে, আপনার তাফসীর বর্ণনা করার মতো শক্তিও অর্জিত হবে। আর আপনি মিথ্যা হতে সত্যকে উদ্ধার করবেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হে আবু হানিফা! আল্লাহ তোমাকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তুমি আমার সুন্নতকে জীবিত করবে। তোমাকে লোকসমাজে বসবাস করতে হবে।'[১]

[১] আল-খতীবুল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৫

## শিক্ষা-মজলিসের বিস্তৃতি

এক স্পেন ব্যতীত অপরাপর প্রত্যেকটি ইসলামি রাজ্য হতেই ছাত্রগণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে পড়া-শোনা করতে আসতেন। যেসব অঞ্চলে সেই প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল তার সংখ্যা গণনা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এর মধ্যে নিম্নলিখিত জেলা ও প্রদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা– মক্কা, মদীনা, দিমাশক, বাসরা, আল-জাযীরা, মিসর, ইয়ামান, বাগদাদ, কিরমান ও নিশাপুর।

## পদগ্রহণে অস্বীকৃতি

খলীফা মরওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক আল-উমাওয়ী ইয়াযীদ ইবনে ওমর ইবনে হুবাইরা আল-ফারারীকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত ধীর-স্থির সাহসী, সৎবংশজাত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি মারওয়ানী হুকুমতের দোষ-ত্রুটির সংশোধন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, উক্ত শাসনধর্ম ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় অপরাপর দিক দিয়ে তেমন কোনো মারাত্মক দোষ-ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও এটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই তিনি ধর্মীয় ভিত্তি সর্বপ্রথমে সুদৃঢ় করার সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। এজন্য তিনি ইরাকের আলেমদেরকে ডেকে এনে বিভিন্ন উচ্চপদে বহাল করতে চাইলেন।

তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে মীর-মুনশী এবং প্রধান খাজাযীর পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) স্পষ্টভাবে তা অস্বীকার করলেন। ইয়াযীদ ইবনে ওমর কসম খেয়ে বললেন, তাঁকে অবশ্যই উক্ত পদ গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য বুযুর্গ ব্যক্তিরাও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে উক্তপদ গ্রহণ করার জন্য বহু অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর পূর্ব মতেই অটল রইলেন। ইয়াযীদ ইবনে ওমর ক্রোধান্ধ হয়ে তাঁকে প্রতিদিন দশ দোর্‌রা করে মারার জন্য আদেশ দিলেন। উক্ত আদেশ পালন করা হলো। তবুও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মনোবৃত্তির বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন সাধিত হলো না।[১]

একদিন খলীফা প্রধান কাজী ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) ও অন্যান্য খাস আলেমদেরকে ডাকলেন। তারপর প্রত্যেক খাদেমের

[১] আল-খতীবুল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৮



নামে কিছু বিষয়-সম্পত্তি লিখে দেওয়ার জন্য দারোগাকে বললেন। তারপর উক্ত দলীল দস্তখতের জন্য আলেমদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কাজী ইমাম শা'বী (রহ.) সাক্ষীস্বরূপ উক্ত দলীলে দস্তখত করলেন। অতঃপর অন্যান্য আলেমগণও এতে দস্তখত করলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কিন্তু এতে দস্তখত করতে রাজি হলেন না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খাদেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মুমিনীন কোথায়? খাদেম বলল, তিনি এখন রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন। তিনি বললেন, হয় আমীরুল মুমিনীন এখানে আগমন করবেন, না হয় আমাকে সেখানে যেতে হবে। অন্যথায় সাক্ষ্য প্রদান দুরস্ত হবে না। রাজকর্মচারীদের মেজাজ প্রায়ই ভালো পাওয়া যায় না। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী হতে নিম্নতম কর্মচারীদের চরিত্রেও এ হীনরোগ পরিলক্ষিত হয়। খাদেম এর অন্যথা হবে কেন? বিশ্ববিখ্যাত ইমামকে খাদেম বলল, কাজী ও অপরাপর ফকীহগণও সাক্ষ্য দান করছেন। কিন্তু আপনি কেন অনর্থক বাড়াবাড়ি করছেন? তবুও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ধীর-শান্তভাবে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আমলের জন্য দায়ী হবে।

এসব আলাপ-আলোচনা খলীফার কর্ণগোচর হলো। তিনি কাজী ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, সাক্ষ্যপ্রদানে কি আমার উপস্থিতি অপরিহার্য অংশ? কাজী ইমাম শা'বী (রহ.) তা স্বীকার করলে খলীফা বললেন, তবে আপনি না দেখে কেন সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন? ইমাম শা'বী (রহ.) বললেন, আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, এটি আপনার জ্ঞাতসারেই হয়েছে। আর এও সত্য যে, আপনাকে এসে দেখে যেতে বলতে আমি সাহস পাইনি। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, এটা কাজী-সুলভ জবাব হয়নি। এমন ত্রুটি যার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তাকে কাজীর পদে বহাল রাখা সমীচীন নয়।

কাজী-পদ অন্য কাকে দেওয়া যায় খলীফা তখন হতে সেই চিন্তায় বিভোর হন। তারপর এ সম্পর্কে আমীর-ওমরার পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) ও ইমাম মিসআর ইবনে কিদাম আল-হিলালী (রহ.)-এর নাম পেশ করলেন। খলীফা চারজনকেই আহ্বান করলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পথিমধ্যে তাঁদেরকে বললেন, আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আমি তো চালাকি করে বেঁচে যাব। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) পালিয়ে যাবেন। ইমাম

মিসআর (রহ.) নিজেকে পাগল বলে প্রমাণিত করবেন। কাজেই কাজী-পদ কাযী শুরাইহ ইবনুল হারিস আল-কিন্দী (রহ.)-এর কাঁধেই নিপতিত হবে।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) সে অনুযায়ী ভেগে গেলেন। তিনি এক কিশতিতে গোপনভাবে রইলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সকলকে নিম্নলিখিত হাদীস শুনিয়ে দিলেন। হাদীস:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ الْـمُسْلِمِيْنَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ».

'হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যাকে মুসলমানের কাজী বানানো হয় তাকে ছুরি ব্যতীতই জবেহ করা হয়।'[১]

অর্থাৎ কাজী-পদ অত্যন্ত দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন না করলে তাকে ভীষণ শাস্তিগ্রস্ত হতে হবে। এর অর্থ দাঁড়ায় না যে, কেউ যেন কাজীর পদ গ্রহণ না করে। ইসলামের আদর্শ-ভ্রষ্ট খলীফার অধীনে কাজী-পদ গ্রহণ করলে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভবপর হবে না ভেবে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এই দায়িত্ব কবুল করেননি।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-কে মাঝিরা গোপন করে নিল। অপরাপর তিনজনই খলীফার দরবারে হাজির হলেন। খলীফা সর্বপ্রথমে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে কাজী-পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আরব দেশের লোক নই। আরব-নেতৃবৃন্দ আমার ফাতওয়াকে গ্রাহ্য করবেন না। খলীফার মন্ত্রী জাফর আল-বারমাকী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, কাজী-পদের সাথে এর কোনো সংশ্রব নাই। বরং এতে ইলমের প্রয়োজন।

একথা শুনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে, আমি কাজী-পদের উপযুক্ত নই। কাজেই আমি যদি সত্য বলে থাকি, তবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আমি উক্ত পদের উপযুক্ত নই। আর যদি মিথ্যা বলে থাকি, তবে মিথ্যাবাদীকে কখনও উক্ত পদে নিযুক্ত করা সমীচীন নয়। আপনি বর্তমান সময়ের খলীফা। আপনার পক্ষে এটা

[১] (ক) আল-খতীবুল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ৬, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৩১৭৮; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ৫২, হাদীস: ৭১৪৫



কস্মিণকালেও শোভা পায় না, আপনি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন মিথ্যাবাদীকে নিযুক্ত করবেন। এসব বলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রেহাই পেলেন।

তারপর ইমাম মিসআর ইবনে কিদাম আল-হিলালী (রহ.) খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে হঠাৎ খলীফার হাত চেপে ধরলেন। আর বললেন, আপনি কেমন আছেন? আপনার সন্তান-সন্ততি কেমন আছে? খলীফা তাঁর এ অবস্থা দেখে তাঁকে উন্মত্ত ভেবে দরবার হতে বের করে দিলেন।

তারপর কাযী শুরাইহ ইবনুল হারিস আল-কিন্দী (রহ.)-কে কাজী-পদ গ্রহণ করার জন্য বলা হলে তিনি বললেন, আমি একজন উন্মত্ত ব্যক্তি। আমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্বল। খলীফা তাঁকে চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। তারপর তাঁকে কাজী-পদে নিযুক্ত করলেন। তখন হতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর সাথে সকল সম্পর্ক ছেদ করলেন। তিনি তাঁর সাথে কোনো কথা পর্যন্ত বলতেন না।

## আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ও আবু জাফর আল-মনসুরের রক্তপিপাসা

আব্বাসীগণ উমাইয়া খান্দানকে যখন প্রায় সমূলে ধ্বংস করে ফেলেছিল, এমনকি সেই বংশের খলীফাদের কবর খনন করে তাঁদের হাড় পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল, তবুও যেহেতু নতুন সরকার গঠিত হচ্ছিল, কোনো সরকারই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত ছিল না এবং বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব-বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, সেসব অশান্তি-বিদ্রোহকে শান্ত করতে গিয়ে আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ও আবু জাফর আল-মনসুর ন্যায়পরায়ণতার সীমা বহুদূর ডিঙিয়ে গিয়েছিল। ফলে মরওয়ানী হুকুমতের ছবি আবার প্রত্যেকের চোখে ভেসে ওঠেছিল। নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে প্রত্যেকের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হতো। কিন্তু এ রক্ত-পিপাসু-দল সকলকে হতাশ করে দিত।

কোনো এক প্রসঙ্গে আবু জাফর আল-মনসুর তাঁর বাল্যবন্ধু আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার শাসনকাল ও মরওয়ানী শাসনকালের মধ্যে কি প্রভেদ আছে? তিনি বললেন, আমার চোখে তো কোনো পার্থক্য ঠেকছে না। তখন মনসুর বললেন, আমি কি করব, কাজের মানুষ তো মিলা ভার। আবদুর রহমান বললেন, যে জিনিসের চাহিদা অধিক বাজারে, তাই অধিক পরিমাণ আমদানি হয়ে থাকে।

সাইয়েদ বংশ সুদীর্ঘকালে অবধি খিলাফত লাভের বাসনা পোষণ করছিলেন। একদিক দিয়ে তাঁদের সেই দাবি করার যথেষ্ট অধিকারও ছিল। কিন্তু এর তেমন কোনো আভাসও পাওয়া যায়নি। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আবু জাফর মনসুর তাঁদেরকে এবং তাঁদের দলীয় লোকের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেই দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি নৃশংস অত্যাচার চলছিল। সেই দলের অন্যতম নেতা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমকে দেওয়াল-চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল।

পরিশেষে হিজরী ১৪৫ সালে মুহাম্মদ আন-নাফসুয যাকিয়া (রহ.) অল্পসংখ্যক লোকসহ পবিত্র মদীনা শহরে পালিয়ে যান। অল্পদিনের মধ্যে সেই দল সংখ্যাপুষ্ট হয়ে উঠল। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ইমাম মালিক (রহ.) ফাতওয়া দান করলেন যে, আবু জাফর আল-মনসুর অন্যায়ভাবে ফিলাফত অধিকার করে নিয়েছেন। খিলাফতের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন আন-নাফসুয যাকিয়া (রহ.)।

## মুহাম্মদ আন-নাফসুয যাকিয়া (রহ.) ও ইবরাহীমের বিপ্লব

মুহাম্মদ আন-নাফসুয যাকিয়া (রহ.) অত্যন্ত সাহসী, শক্তিমান ও যুদ্ধ-বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস কেউই ফেরাতে পারে না। হিজরী ১৪৫ সালে অপূর্ব সাহসের সাথে যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হন। এরপর তাঁর ভাই ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) এর চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিলেন। তিনি এমনই বিপুল আয়োজন সহকারে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন যে, আবু জাফর আল-মনসুরের হুঁশ পর্যন্ত হারানোর উপক্রম হলো। তাতে তিনি এমনই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, দু'মাস পর্যন্ত তিনি কাপড় বদলানোর অবসর পেলেন না।

একদিন দু'জন সুন্দরী নারী আবু জাফর আল-মনসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে তিনি তাদের সাথে কোনো কথাই বললেন না। কোনো এক ব্যক্তি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এসব অবসর সময়ের ব্যাপার। এখন তো আমি এই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত আছি যে, আমার শির প্রথমে ছিন্ন হবে নাকি ইবরাহীমের শির।

ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) একজন জনপ্রিয়, জবরদস্ত আলেম ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। সুতরাং তাঁর খিলাফত লাভের আন্দোলন চারদিকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু কুফা নগরেই প্রায় বিশ লক্ষ লোক তাঁর জন্য প্রাণ



দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ধর্মপ্রাণ মুসলমান, বিশেষভাবে আলেম ও ফকীহবৃন্দ তাঁর পতাকা তলে সমবেত হলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রথম হতেই আব্বাসীদের অত্যাচার-অবিচার অবলোকন করে আসছিলেন। আর আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফার জমানায় এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা খিলাফত পাওয়ার উপযুক্ত লোক নয়। ইবরাহীম ইবনে মাইমুন আস-সায়িগ আল-আরওয়াযী (রহ.) একজন দীনদার আলেম ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একজন পরম বন্ধুও ছিলেন। এ সম্পর্কে চুপ থাকা সমীচীন কিনা তা তিনি প্রায়ই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলতেন, সৎকাজে আদেশ অসৎকাজে নিষেধ ফরয। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, তেমন শক্তি সঞ্চয় করা চাই।

হিজরী ১৪৫ সালে ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) যখন খিলাফতের আন্দোলন জোরেশোরে চালালেন তখন অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিজেও সেই সংগ্রামে যোগদান করতে চাইলেন। কিন্তু কয়েকটি অপরিহার্য কারণে তাতে যোগদান করতে পারলেন না। এজন্য তিনি চিরকাল আক্ষেপ করে ছিলেন।

## ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)-এর পাশে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

তিনি ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)-এর কাছে নিম্নলিখিত চিঠি লিখেন, আমি আপনার কাছে চার হাজার দিরহাম পাঠাচ্ছি। বর্তমানে আমার হাতে এরচেয়ে অধিক অর্থ নেই। আমার কাছে লোকের আমানত না থাকলে আমি অবশ্যই আপনার সাথে মিলিত হতাম। আপনি যদি দুশমনের ওপর জয়লাভ করতে পারেন তবে আপনার পূর্ব-পুরুষ হযরত আলী (রাযি.) জঙ্গে সিফ্ফীন অংশগ্রহণকারীদের প্রতি যে রকম ব্যবহার করছেন আপনিও তাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করবেন। কিন্তু আপনার পিতৃপুরুষ উষ্ট্রযুদ্ধে আহত ও পলায়নপর লোকদের নিহত করার যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সেই নীতি অবলম্বন করবেন না। কেননা তারা সংখ্যায় অসংখ্য।[১]

এ চিঠি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি বিশ্বাসযোগ্য কিতাব হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ চিঠি সহীহ হোক বা ভুল হোক কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে,

[১] আর-যিরিকালী, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ৪৮–৪৯

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) স্পষ্টভাবে ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)-এর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যদিও স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি তবুও সর্বদিক দিয়ে তিনি তাঁকে আপ্রাণ সাহায্য করেন। ইবরাহীমকে শৃঙ্খলার অভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তিনি বাসরায় মহা পরিক্রম ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ইন্তিকাল করেন।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মৃত্যুশোক

হিজরী ১৪৬ সালে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে আবু জাফর আল-মনসুর কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে কারারুদ্ধ করেও মনসুর শান্তিতে কালযাপন করতে পারেননি। বাগদাদ রাজধানীতে পরিণত হওয়ায় এটি শিক্ষা-দীক্ষারও কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রবৃন্দ ইসলামি রাজ্যের চারদিক হতে বাগদাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যশ ও সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছিল। কারারুদ্ধ হওয়ায় তিনি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। শহরের ওপর বাগদাদের আলেম-ওলামা ও পীর-ফকীহদের প্রবল-পরাক্রান্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখতেন।

আবু জাফর আল-মনসুর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সম্মানের ওপর আঘাত করবে এমন কিছু করা মনসুরের ক্ষমতার বাইরে ছিল। জেলখানার ভেতরেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যথারীতি শিক্ষাদান কাজ চালিয়ে গেলেন। বিশ্ববিখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান এই জেলখানাতেই ইমাম আযম (রহ.)-এর কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

যে ভয়ে ভীত হয়ে আবু জাফর আল-মনসুর তাঁকে কারারুদ্ধ করেন কারারুদ্ধ করেও তিনি তা হতে রেহাই পাননি। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আদর্শের বিপরীতভাবে শাসন করা খলীফার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মনসুর পরিশেষে গোপনে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে খাওয়ালেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিষক্রিয়া বুঝতে পেরে সাজদায় পড়ে যানে। সেই অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।



তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ঝড়ো-গতিতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। সারা সাম্রাজ্য থেকে মানুষ বাগদাদে জড়ো হয়। শহরের কাজী তাঁকে গোসল করালেন। গোসল করার সময় তিনি বলছিলেন, আল্লাহর কসম! হে মহান! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ, আবিদ ও যাহিদ ছিলেন, আপনি সর্বগুণের আধার ছিলেন, আপনি অতিউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। গোসলদানের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁর জানাযায় শামিল হলো। তবুও লোকের ভীড় কমিল না। চারবার তাঁর জানাযা পড়া হলো। এক বর্ণনায় আছে, ১২ বার জানাযার নামায পড়া হয়েছিল। আসরের সময় ঘনাইয়ে আসল তাঁকে দাফন করা হয়।

খায়যুরানের কবরস্থানে দাফনোর জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অসিয়ত করে যান। তাঁর ধারণা ছিল, এ জায়গা আল্লাহর ক্রোধ-মুক্ত। সেই অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে সেখানে দাফন করা হলো। তাঁর জনপ্রিয়তা এরচেয়ে অধিক কি প্রমাণ থাকতে পারে!

## শোক-গীতি

তখন সেই রাজ্যে বহু নামজাদা ধর্মীয় নেতা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কয়েকজন উস্তাদও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সকলেই শোকাকুল হন।

ইমাম ওয়াকী' ইনবুল জার্‌রাহ (রহ.) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মৃত্যুসংবাদ শুনে বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি, বহু বড় একজন আলেম আজ দুনিয়া ছেড়ে গেলেন।'

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খ ও বাসরার ইমাম হযরত ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-আযদী (রহ.) বললেন, 'কুফা অন্ধকার হয়ে গেল।'

কিছুদিন পর ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বাগদাদ যাওয়ার পথে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কবরের পাশে গিয়ে কান্না করতে করতে বললেন, 'আবু হানিফা! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুক! ইবরাহীম মরে গেলেও তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত লোক রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু হে মহান! সমগ্র দুনিয়ায়ও আপনি আপনার একজন স্থলাভিষিক্ত লোক রেখে যাননি।'

তাঁর মাযার চির সম্মান লাভ করল। আজও হাজার হাজর লোক তা যিয়ারত করে থাকে। তাঁর মাযারের সন্নিকটে একটি মাদরাসা স্থাপন করা হয়েছে। এমন সুরম্য অট্টালিকার মাদরাসা অতিবিরল। সেই মাদরাসার পাশে

একটি মুসাফিরখানাও স্থাপিত হয়েছে। ইসলামি রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হতে যেসব শিক্ষার্থী ইলম শিক্ষা করতে আসতেন তারা এখানে আহার ও বাসস্থান পেতেন। আজও এর শান-শওকত ও ইজ্জত-গৌরব দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সন্তান-সন্ততি

তাঁর সন্তান-সন্ততির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া কঠিন। তবে এতটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মৃত্যুর সময় ইমাম হাম্মাদ ইবনুন নু'মান (রহ.) ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো সন্তান জীবিত ছিলেন না। ইমাম হাম্মাদ (রহ.) অতিউচ্চ শ্রেণির আলেম ছিলেন। শৈশব থেকেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁকে শিক্ষাদান করা হয়। ছেলেটি যখন আল-হামদু খতম করলেন তখন তাঁর আব্বাজান উস্তাদকে পাঁচ-শত দিরহাম হাদিয়াস্বরূপ দান করেন।

তারপর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) স্বয়ং তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ইলম ও ফযলের সঙ্গে সঙ্গে পরহেজগারি ও দিয়ানতদারিতেও তিনি পিতার উপযুক্ত সন্তান হিসেব পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর ঘরে লোকের বহু মাল-সম্পদ আমানত ছিল। তাঁর পুত্র সেসব মাল-সম্পদ শহরের কাজীর কাছে জমা রেখে বললেন যার যার মাল তাকে বিলিয়ে দিন। কাজী সাহেব বললেন, এগুলো আপনার কাছেই রেখে দিন। আপনার কাছে এই মাল-সম্পদ অধিক যত্নে থাকবে। আপনি এদের লিস্ট রেখে দিন। এর কোনো কিছু যেন দাগ না পড়ে। তিনি কাজী সাহেবকে সম্পূর্ণ মাল বোঝায়ে দিয়ে নিজে রেহাই পেলেন।

ইমাম হাম্মাদ ইবনু নু'মান (রহ.) কোনোদিন চাকরি করেননি। শাহি দরবারের সাথে তিনি কোনো সম্পর্ক রাখতেন না। তিনি হিজরী ১৭৬ সালে ইন্তিকাল করেন। ওমর, ইসমাঈল, আবু হাইয়ান ও উসমান নামে চারজন পুত্র তিনি রেখে যান। ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (রহ.) ইলম ও ফযলের দিক দিয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খলীফা মামুনুর রশীদের দরবারে তিনি কাজীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি এমনই ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার সাথে স্বীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন যে, তিনি যখন বাসরা হতে চলে আসেন তখন সারা শহরের লোক তাঁর পিছনে ছুটে যান। সকলেই তাঁর জান-মালের জন্য দুআ করতেন।



## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর স্বভাব-চরিত্র ও আমল-আখলাক

শায়খ আবু আলী বলছেন, আমি একবার তুরস্কে গিয়েছিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুওয়াযযিন হযরত বিলাল (রাযি.)-এর কবরের পাশে শুয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখি, আমি মক্কা শরীফে অবস্থান করছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুকে কোলে নেওয়ার মতো এক বৃদ্ধকে কোলে করে বনি শায়রার দরজা দিয়ে বের হয়েছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে হুযুরের কদমবুচি করলাম। এ বৃদ্ধলোকটি কে তা আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় প্রেমের নবী বলে ওঠলেন, তিনি মুসলমানদের ইমাম আবু হানিফা।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর অবধি ইশার নামাযের ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছিলেন। ত্রিশবছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে রোযা রাখতেন। তিনি যেখানে ইন্তিকাল করেন সেখানে সাত হাজারবার কুরআন খতম করা হয়। তিনি প্রতিরাতে তিন শত রাকআত নামায পড়তেন।

একদিন তিনি পথ অতিক্রম করার সময় এক স্ত্রীলোককে বলতে শুনলেন, 'এই ব্যক্তি প্রতিরাতে পাঁচশত রাকআত নামায পড়ে থাকেন।' একথা শুনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) চিন্তা করলেন যে, তখন হতে তিনি প্রতিরাতে পাঁচশত রাকআত নামায পড়বেন, তা হলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিনী হবেন না।

অপর একদিন তিনি বালকদেরকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন, এই ব্যক্তি প্রতিরাতে হাজার রাকআত নামায পড়েন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখন হতে প্রতিরাতে হাজার রাকআত নামায পড়তে আরম্ভ করলেন। একছাত্র বললেন, হুযুর! লোকেরা বলে থাকে যে, আপনি সারারাত জেগে নামায পড়েন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখন হতে রাতে আর শুতেন না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একদিন এক ধনী ব্যক্তিকে তার ধনের জন্য যথেষ্ট সম্মান করেছিলেন। অতঃপর মনে মনে দুঃখিত হয়ে এক হাজারবার কুরআন খতম করে এজন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

নওফেল ইবনে হাইয়ান বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর আমি একরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, সকল লোক হাশরের ময়দানে উপস্থিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) হাউযে কাওসারের কাছে দাঁড়ানো এবং এবং তাঁর ডানে ও বামে বহু বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ দাঁড়ানো। তাঁদের মধ্যে আমি একজন অত্যন্ত সুন্দর বৃদ্ধ পুরুষকে দেখতে পেলাম, তাঁর মাথা ও মুখ সাদা।

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর পাশে।

আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে সালাম জানিয়ে কিছু পানি চাইলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আদেশ না দেবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি পানি দিতে পারি না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে পানি দিতে আদেশ করলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আমাকে পানি দিলে আমিও আমার বন্ধু তা পান করলাম। কিন্তু পেয়ালা পূর্ণই রয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দক্ষিণ পাশে এই সুন্দর পুরুষটি কে?

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং বামে হযরত আবু বকর আস-সিদ্দিক (রাযি.)। তারপর আমি অন্যান্য বুযুর্গদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উত্তর দান করেছিলেন। আমি সতর ব্যক্তির নাম আঙুলে গণনা করলাম। জেগে আমার আঙুল করের সতর দাগে আবদ্ধ পেলাম।

ইয়াহইয়া আর-রাযী (রহ.) নামক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি আমাকে আবু হানিফার জ্ঞানরাশির মধ্যে পাবে। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পায়রবি করলেই আমার সন্তুষ্টি পাবে।'

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রশংসায় ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)

খলীফা হারুনুর রশীদের কানে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর কতো না প্রশংসাগীতি পৌঁছেছে! রূপ-কথার ন্যায় প্রতিঘরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাহিনি বর্ণিত হয়। খলীফার স্পৃহা তাতেও থামে না। তিনি একদিন কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) বললেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) অত্যন্ত পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার পাপ হতে দূরে থাকতেন, তিনি চিন্তাশীল, প্রায়ই তিনি চুপ থাকতেন। কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসিত হলে ওয়াকিফহাল থাকলে জবাব দিতেন, অন্যথায় খামোশ থাকতেন।

তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও দানশীল ছিলেন। কারও কাছে কোনো কিছু চাইতেন না। দুনিয়াদারদের সংস্পর্শে যেতেন না। পার্থিব বাসনা-কামনা,



সম্মান-প্রতিপত্তির প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ছিলেন। মাল-সম্পত্তি ও ইলম তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। হারুনুর রশীদ এসব শুনে বললেন, সালিহদের অবস্থা এ রকমই হয়ে থাকে।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শারীরিক গঠন ও আলাপ-আলোচনা

তাঁর স্বভাব-চরিত্রের ন্যায় শারীরিক সৌন্দর্যেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আকার আয়তন মানানসই, চেহারা সুশ্রী, মধ্যম রকমের শরীর, মিষ্টভাষী, স্বর উচ্চ, স্পষ্ট। সংকট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তিনি অতিঅনায়াসে ও স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করতে পারতেন।

## পোশাক

মেজাজ ছিল গুরুগম্ভীর। তিনি প্রায়ই উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। কোনো কোনো সময় মূল্যবান পোশাকও পরিধান করতেন। তাঁর একছাত্র বলেন, আমি একদিন তাঁকে মহামূল্যবান পোশাক পরিধান করতে দেখলাম। এর মূল্য চারশত দিরহামের কম হবে না।

নসর ইবনে মুহাম্মদ একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি নসর ইবনে মুহাম্মদকে বললেন, কিছু সময়ের জন্য আপনার চাদরখানা আমাকে দিন তো তিনি ফিরে এসে বললেন, আমি আপনার চাদরখানা ব্যবহার করে আরাম পাইনি। আমি একে যতো পছন্দসই মনে করেছিলাম তা তদ্রূপ নয়।

নসর বলেন, আমি সেই চাদরখানা পাঁচ দীনার দ্বারা খরিদ করেছিলাম। আমি একে খুব সৌখিন পোশাক মনে করতাম। কাজেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওজর শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু অন্য একসময় তাঁর পরিধানে একটি চাদর দেখতে পেলাম। এর মূল্য ত্রিশ দীনারের কম হবে না। তখন আমার পূর্ব আশ্চর্যভাব বিদূরিত হলো।

## দরবারি টুপি

খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর স্বীয় দরবারের জন্য বিশেষ টুপির প্রচলন করেছিলেন। এ টুপিগুলো দামি এবং বিবিধ কারুকাজ করা। আকার আয়তনে উচ্চ ধরনের ছিল। এ সম্পর্কে এক কবি অতিসুন্দর বলছেন যে, খলীফার সাথে আমাদের যতোখানি সম্ভবপর মিলমিশ রাখা আবশ্যক।

কাজেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অন্য কোনো দিক দিয়ে না হলেও টুপি পরিধানের দিক দিয়ে সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যদিও রাজ-দরবারের আঙিনাও মাড়াতেন না, কিন্তু আমীর-ওমরা ও দরবারি লোকেরা যেসব বিশেষ টুপি ব্যবহার করতেন, তিনি মাঝে-মাঝে সেসব টুপি ব্যবহার করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরিচ্ছন্ন ঘরে প্রায়ই সাত-আটটি টুপি মজুদ থাকত। ধনী ও দুনিয়াদারদের জন্য এটা অতিসাধারণ কথা। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বেলায় এ রকম ব্যাপার দেখে আলেম-সমাজ আশ্চর্যবোধ করতেন।

বিশ্ববরেণ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাঝে-মাঝে দরবারি টুপি পরিধানে শুধু তাঁর চরিত্র নয়, বরং জ্ঞানী-মানী ও বিপ্লবী বীর-পুরষদের একটি চারিত্রক ছবি ফুটে উঠছে। মহৎ লোকেরা অকিঞ্চিৎকর পৃথিবীতে অকিঞ্চিৎকর রূপেই দেখে থাকেন। এ সংসারের মোহ-মায়া তাঁদেরকে সংস্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহর এ আকাশ-তলে আল্লাহ ব্যতীত জিনরূপী বা মানবরূপী কোনো শয়তানের শাসন কায়েম হবে এটা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। সেই বিদ্রোহী মনের উজ্জ্বল আলোকে তাঁরা মিথ্যা ও অলীক অন্ধকারকে ক্ষণিকের জন্যও সমর্থন করতে পারেননি।

এজন্যই অসত্য ও অন্ধকার জগতের বিরুদ্ধে তাঁদের আপোসহীন চিরবিদ্রোহ ঘোষিত রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দরবারি টুপি ব্যবহারের ন্যায় অন্যান্য কার্যাবলি দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিপ্লব তাঁদের বাতিক নয়। নিতান্ত নিরুপায় না হয়ে তাঁরা কোনোদিন বিপ্লব-বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের আপোসহীন সংগ্রাম চললেও শুধু সংগ্রামের খাতিরে তাঁরা সংগ্রাম করেন না। কোনো ব্যক্তিগত লোকের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম পরিচালিত হয় না।

## সরকারি প্রভাব হতে মুক্ত থাকা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাধারণ আলেম-ওলামা হতে পৃথক ছিলেন। তাঁর সমকক্ষ বহু আলেমই তখন শাহি দরবারে বা আমীর-ওমরার বৃত্তি ও জায়গীর ভোগ-দখল করতেন। তাঁরা এসবকে আদৌ দোষের বিষয় মনে করতেন না। বেতনভোগী জনৈক কাজী সাহেবকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জবাবস্বরূপ কোনো কোনো সাহাবী বা বহু তাবে তাবিয়ীদের উদাহরণ পেশ করেন যে, তাঁরাও এসব বেতন ও অজিফা ভোগ করতেন।



তখনও কোনো প্রকার বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ না করে ওলামায়ে কেরাম শিক্ষা দান করতেন। আলেমগণ নিজেদের বাড়ি বা মসজিদের লোকদেরকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতেন। আর সেই ধারা এমনভাবে প্রসারিত ও উপকারী ছিল যে, আজ পর্যন্ত এরচেয়ে উত্তম পন্থা কেউ অবলম্বন করতে সমর্থ হননি। রাজ-সরকার বা আমীর-ওমরার পক্ষ হতে যা কিছু বেতন দেওয়া হতো বা মাঝে-মাঝে পুরস্কার বা উপঢৌকনস্বরূপ যা কিছু মিলতো তা-ই পরোক্ষভাবে বেতনে পরিণত হতো। কিন্তু এটি অস্বীকার করা চলে না যে, রাজকীয় চাকরি বা উপঢৌকন ভোগ করলে পীরজাদাগিরি ও পরমুখাপেক্ষিতা প্রশ্রয় পায়। এসবের পরিণাম হচ্ছে, এ ধরনের সমাজের এক বিরাট অঙ্গকে অলস ও অকেজো করে দেয়।

এজন্যই ইমাম আযম (রহ.) এসবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর সেই আপোসহীন সংগ্রামের ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধে তিনি কোনো কিছুতেই পরোয়া করেননি। মানুষ যতোই আজাদি স্বভাব ও স্পষ্টবাদী হোক না কেন, কিন্তু উপকার এমনই গুপ্ত যাদু যে এর প্রভাব হতে মুক্ত থাকা যদিও অসম্ভব নয়। তবুও তাঁরা কস্মিনকালেও বিপদের আশঙ্কা হতে খালি নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আজীবন কারও বিন্দুপরিমাণ সাহায্যও গ্রহণ করেননি। এজন্যই তাঁর আজাদিকে খরিদ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

## স্বাধীনচেতা মনোভাব

কুফার বিখ্যাত গভর্নর ইয়াযীদ ইবনে ওমর ইবনে হুবাইরা আল-ফারারী একদিন বিনীতভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে বললেন, হযরত! আপনি যদি মাঝে-মাঝে এ গরীবালয়ে পদার্পণ করেন তবে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আপনার সাক্ষাৎ লাভ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এখানে আসেন তবে ভয় আছে যে, আমি আপনার ফাঁদে নিপতিত হবো। আর যদি আপনি আমার অপমান করেন তবে আমার পক্ষে তা সুখের বিষয় হতে পারে না। আপনার কাছে যে মাল-সম্পত্তি আছে, আমি এর আকাঙ্ক্ষী নই। আর আমার কাছে যে সম্পত্তি আছে, তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

## নিঃস্বার্থ সত্য-প্রচার

একদিন খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটে। তাঁর বিবির অভিযোগ হচ্ছে, খলীফা ন্যায়বিচার

করেন না। খলীফা একজন বিচারক সাব্যস্ত করতে বললে বিবি সাহেবা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নাম পেশ করলেন। অবিলম্বে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে আনয়ন করা হলো। সবকিছু দেখাতে এবং শুনতে বিবি সাহেবা পর্দার আড়ালে বসে রইলেন।

খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর বললেন, শরীয়ত অনুযায়ী পুরুষ কয়টি বিয়ে করতে পারে? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, চার। খলীফা মনসুর তাঁর বিবিকে লক্ষ করে করে বললেন। তুমি শুনেছ কি? পর্দার আড়ালে থেকে বিবি সাহেবা তা স্বীকার করলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খলীফা মনসুরকে লক্ষ করে বললেন, কিন্তু আদেশ তার জন্য সীমাবদ্ধ যে প্রত্যেক বিবির সাথে ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা রাখে। অন্যথায় একের অধিক বিয়ে করা বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

'আর যদি ভয় কর যে, ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে এক বিয়ে করবে।'[১]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ঘরে পৌঁছার পর এক খাদেম পঞ্চাশ হাজার দিরহামের একটি থলে তাঁর খেদমতে পেশ করে জানাল যে, বেগম সাহেবা তা প্রেরণ করেছেন। তিনি আপনার কাছে সালাম জানিয়েছেন। আর আপনার সত্যপ্রিয়তার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দিরহামগুলো এ বলে ফেরত দিয়ে খাদেমকে বললেন যে, তুমি গিয়ে বেগম সাহেবাকে জানিয়ে দাও যে, আমি যা কিছু বলেছি তা কোনো স্বার্থের বশীভূত হয়ে বলিনি। তা আমার অবশ্য কর্তব্য কর্ম ছিল।

## ব্যবসা ও দিয়ানত

তিনি খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষ্যে তাঁকে বহু টাকার আদান-প্রদান করতে হতো। প্রায় শহরেই তাঁর কাজ-কারবার ছিল। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাথে তাঁর যোগযোগ ছিল। কিন্তু তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন যে, তাঁর তহবিলে যেন একটি না-জায়েয পয়সাও না ঢুকে। এসব কারণে তাঁকে মাসে মাসে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু এর জন্য তিনি কোনো পরোয়া করতেন না।

[১] আল-কুরআন, *সুরা আন-নিসা*, ৪:৩



একদিন তাঁর এক কর্মচারীর কাছে তিনি কাপড়ের কতিপয় থান পাঠিয়ে দেন। তিনি তাকে এও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অমুক থানে দোষ রয়েছে। তা যেন ক্রেতাকে দেখিয়ে বিক্রয় করা হয়। কর্মচারী তা ভুলে যান, মালগুলো বিক্রয় করে ফেলা হয়। কিন্তু দোষের কথা গ্রাহককে বলে দেওয়া হলো না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সমুদয় টাকা দান করে ফেললেন।

একদিন এক স্ত্রীলোক এক দামি কাপড়ের থান ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে বিক্রয় করতে গেলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মূল্য কত জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রীলোক এর দাম একশত টাকা চাইল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, এর মূল্য এত কম নয়। স্ত্রীলোক তখন এর দাম দুইশত টাকা চাইল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, এর মূল্য পাঁচশত, টাকা দুইশত টাকা হতে পারে না। স্ত্রীলোক বলল, আপনি বোধ হয় আমার সাথে হাসি-তামাশা করছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখন পাঁচশত টাকা এনে স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দিলেন। এ ধরনের সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার দরুণ তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকতর উন্নতি হয়েছিল।

## দানশীলতা

তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পত্তি যতোই বৃদ্ধি পেতে লাগল, জনসাধারণ ততোই অধিক উপকৃত হতে লাগল। তাঁর যতো বন্ধু-বান্ধব ছিলো এবং যতো লোক তাঁর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতো প্রত্যেকের জন্য তিনি মাথাপিছু নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত করে রাখছিলেন। শায়খ ও মুহাদ্দিসদের জন্য তিনি কারবারের একটি নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে দেন। তা হতে যে আয় হতো তা প্রতি বছর তাঁদেরকে বিলিয়ে দিতেন।

তাঁর একটি সাধারণ অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি তাঁর পরিবারস্থ লোকের জন্য যে পরিমাণ বস্তু খরিদ করতেন সেই পরিমাণ বস্তু তিনি মুহাদ্দিসীন ও আলেমদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। কোনো লোক তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে তার হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন। অভাবী হলে তিনি তাদের অভাব দূর করে দিতেন।

## ছাত্রদের প্রতি আচরণ

নিঃস্ব ছাত্রদেরকে তিনি এত পরিমাণ অর্থ দান করতেন যেন স্বাচ্ছন্দে তারা লেখাপড়া করতে পারে। এমন অসংখ্য লোকও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া

যেতো অর্থাভাবে যাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাহায্যক্রমে তাঁরা নামজাদা আলেম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) অন্যতম। পরে তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

## মহানুভবতা

একদিন কিছু লোক তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। তাদের মধ্যে এক লোককে বাহ্যিকভাবে ভীষণ অভাবগ্রস্ত বলে বোঝা গেল। লোকটি বিদায় হয়ে চলে যেতে চাইলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাকে কাছে ডেকে বললেন, থাম। তারপর তিনি তাকে বিছানা উল্টাতে আদেশ করলেন। লোকটি সেখানে হাজার দিরহাম পরিপূর্ণ থলে দেখতে পেল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাকে তা উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলে লোকটি বলল, আমি অভাবগ্রস্ত নই। অপর লোককে তা দিয়ে দিন। তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, তবে তোমার এমনভাবে থাকা উচিত যেন লোক তোমাকে অভাবগ্রস্ত বলে সন্দেহ না করে।

## হৃদয়ের প্রশস্ততা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একদিন কোনো রোগীকে দেখার জন্য কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর দেখা হলো। তিনি সেই ব্যক্তির কাছে টাকা পাওনা ছিলেন। দূরে থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে সেই ব্যক্তি পাশ কেটে চলে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? লোকটি তখন দাঁড়াল। তিনি বললেন, আমাকে দেখে তুমি পাশ কেটে যাচ্ছিলে কেন? লোকটি বলল, আমি আপনার কাছ হতে দশ হাজার দিরহাম এনেছিলাম। আমি আজ পর্যন্ত ও তা শোধ করতে পারিনি। সেই লজ্জায় আপনার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিলাম না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তার আত্মসম্মানবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা যাও, আমি তোমাকে সমুদয় টাকা ক্ষমা করে দিলাম।

## পরদুঃখ-কাতরতা

একদিন আবদুল্লাহ আস-সাহমীর সঙ্গে তিনি হজের সফরে ছিলেন। এক মনযিলে এক ব্যক্তি আবদুল্লাহকে ধরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সম্মুখে



নিয়ে আসল। লোকটি বলল, আমি তার কাছে টাকা-পয়সা পাওনা রয়েছি। কিন্তু সে তা আদায় করে দিচ্ছে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করল। তিনি পাওনাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কত টাকা পাওনা ছিল। সে চল্লিশ টাকার উল্লেখ করলে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আজকাল লজ্জা-শরম ওঠে গেছে। এত সামান্যের জন্য কি ঝগড়া করতে হয়? অতঃপর সব টাকা তিনি দিয়ে দিলেন।

ইবরাহীম ইবনে আতিয়ার চার হাজার দিরহাম ঋণ ছিল। তিনি তা কিছুতেই পরিশোধ করতে না পেরে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে কালযাপন করতে লাগলেন। এমনকি লোকের সাথে মেলামেশা তিনি পরিত্যাগ করলেন। তাঁর একবন্ধু তা আদায় করতে দেওয়ার মানসে চাঁদা আদায়ে নেমে গেলেন। লোকেরাও আপ্রাণ সাহায্য করতে লাগল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছেও চাঁদা চাইলেন তিনি মোট ঋণ কত জিজ্ঞাসা করলেন। বন্ধুটির মুখে চার হাজার দিরহাম ঋণের কথা শুনে তিনি বললেন, এত সামান্য টাকার জন্য লোকদের বিরক্ত করে লাভ নেই। অতঃপর তিনি নিজ পকেট হতে চার হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনে এরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে।

## ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা

তিনি যেমন ছিলেন মহাসম্মানী ও সম্পদশালী তেমনই ছিলেন বিনীত, ভদ্র ও ধৈর্যশীল। একদিন তিনি এক মসজিদে অবস্থান করছিলেন। সেখানে বহু ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ ছিলেন। এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যথাযথ উত্তর দিলেন। কিন্তু সেই লোকটি বলল, হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর অন্যরূপ জবাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর জবাব ভুল হয়েছে।

সেই মজলিসে হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর এক অন্ধ ভক্ত ছিল। সে ক্রোধান্ধ হয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে যা ইচ্ছে তা বলতে লাগল। তখন সভাস্থ সকল মহাগরম হয়ে ওঠল। তারা প্রতিবাদকারীকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাইল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সকলকে শান্ত করলেন। অতঃপর প্রতিবাদকারীকে বললেন, হ্যাঁ হযরত হাসান আল-বাসরী

(রহ.) ভুল করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) যা বর্ণনা করেছেন, তা সহীহ।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মধ্যে কিছু মতবিরোধ ছিল। এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে এসে বলল যে, সুফিয়ান আস-সাওরী আপনার কুৎসা রটনা করছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আল্লাহ আমাকে ও সুফিয়ান আস-সাওরীকে ক্ষমা করুন।

## অপ্রিয় ব্যবহারের জবাব

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মসজিদে একদিন শিক্ষাদান করছিলেন। তাঁর সাথে এক ব্যক্তির শত্রুতা ছিল। সে তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি ভীষণ অপ্রিয় ব্যবহার আরম্ভ করে দিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলেন না। তিনি শিক্ষাদান শেষ করে বাড়ি রওয়ানা হলেন। সেই ব্যক্তিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল। আর মুখ দিয়ে যা আসে তাই বলে যেতে লাগল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বাড়ির কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই, এই তো আমার বাড়ি। তোমার যদি আরও কিছু বলার শখ থেকে থাকে তবে তা বলে শেষ করে নিতে পারেন। আমি বাড়ির ভেতরে চলে গেলে তোমার সেই সুযোগ মিলবে না।

একদিন তিনি ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছিলেন। এক যুবক একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর উত্তর দিলেন। যুবক বলল, ইমাম! আপনার জবাব ভুল হয়েছে। আবুল খাত্তাব আল-জুরজানীও সেখানে ছিলেন। তিনি মহারাগান্বিত হয়ে সমবেত লোকদেরকে লক্ষ করে বললেন, আপনাদের কোনো মান সম্ভ্রম নেই। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে একজন নরপশু যা ইচ্ছে তা বলছে, আর আপনারা তা নীরবে সহ্য করছেন! ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আপনি তাদের ওপর দোষারোপ করবেন না। আমি এসব জায়গায় এজন্য বসে থাকি যে, লোকেরা যেন স্বাধীনভাবে আমার দোষ-ত্রুটি বের করতে পারে এবং আমি তা নীরবে সহ্য করব।[১]

---

[১] আবদুল কাদির আল-কুরাশী, *আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানীফা*, খ. ২, পৃ. ২৯৭:
عَن أبي الْخطاب الْجِرْجَانِيّ قَالَ كنت عِنْده أذ سَأَلَهُ شَاب عَن مسئلة فَأجَاب فَقَالَ الشَّاب اخطأت ثـمَّ سَـأَلَهُ عَن أُخْرَى فَأجَاب فَقَالَ الشَّاب اخطأت فَقَـالَ لأَصْـحَابه سُبْحَانَ الله أَلا تعظمـون الشَّـيْخ يجِئ إِلَيْـهِ شَـاب فيخطئه مرَّتَيْنِ وَأَنْتُم سكُوت فَقَالَ لِي الإِمَام دعهم دعهم فَإِنِّي عودتهم من نَفسِي ذَلِك.



## প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয়তা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মহল্লায় এক মুচি বাস করত। সে খুব খোশ-মেজাজী ও রসিক ছিল। সে সারাদিন পরিশ্রম করত। সন্ধ্যায় বাজারে গিয়ে গোস্ত ও শরাব ক্রয় করত। রাত্রিকালে তার বন্ধু-বান্ধব সমবেত হতো। সে নিজেই খাবার তৈরি করে বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে খাবারে বসে যেত। আহারশেষে শরাব-পান ও গান-বাজনা চলত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যিক্‌র-আযকারে রাত কাটিয়ে দিতেন। মুচির সেসব আমোদ-আহ্লাদ ও গান-বাজনা তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করত। আর তাঁর স্বভাব এমন কোমল ছিল যে, তিনি মুচির কার্যকলাপের কোনো প্রতিবাদ করতেন না।

একদিন রাতে শহরের পাহারাদার সেদিকে আসলে মুচির এ অবস্থা দেখে তাকে গ্রেফতার করে। প্রভাতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর বন্ধু-বান্ধবদেরকে বললেন, আজরাতে আমার প্রতিবেশীর কোনো আওয়াজ পাইনি কেন? তখন লোকেরা রাতের ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি তা শোনামাত্র গাড়ি আনালেন। দরবারের পোশাক পরিধান করে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

তখন আব্বাসীদের রাজত্ব। খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর ইসা ইবনে মুসাকে কুফার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি খুব সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। লোকেরা গভর্নর বাহাদুরকে সংবাদ দিল যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে স্বাগত জানানোর জন্য গভর্নর তাঁর অমাত্যবর্গকে পাঠিয়ে দিলেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর গাড়ি রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসার জন্য তিনি আদেশ করলেন। গাড়ি যথাস্থানে পৌঁছলে গভর্নর তাঁর সম্মানার্থে ওঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর পাশাপাশি আসনে বসালেন। তারপর বললেন, আপনি এত কষ্ট স্বীকার করছেন কেন? আমাকে খবর দিলেই আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হতাম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আমার মহল্লায় এক মুচি থাকে। কোতোয়াল তাকে গতরাতে গ্রেফতার করে এনেছেন। তাকে কারামুক্ত করে দিলে আমি খুশি হবো।

গভর্নরের আদেশক্রমে মুচিকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যবহারে মুচি মোহিত ও মুগ্ধ হলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছ হতে সে কোনো দিন এমন ব্যবহার আশা করেনি। তখন সে সবকিছু অপকর্ম পরিত্যাগ করল। তখন হতে সে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-

এর কাছে পড়াশোনা করতে লাগল। ধীরে-ধীরে সে ফিকহশাস্ত্রে মহাপাণ্ডিত্য অর্জন করে। পরবর্তীকালে মুচি একজন নামকরা ফকীহরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

## মাতৃ-সেবা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যৌবনে পদার্পণ করার পূর্বে তাঁর পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু তাঁর মাতা অবধি জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর জীবনে মাতৃ-খেদমত করার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। বক্তা ও গল্প-কাহিনি বিবৃতিকারীদের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল।

কুফায় ওমর ইবনে যারকা নামক একজন বিখ্যাত ওয়ায়িয ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাতা তাঁর পরম ভক্ত ছিলেন। কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হলে তা জানার জন্য ইমামের মাতা তাঁকে সেই বক্তার কাছে প্রেরণ করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মাতৃ-আদেশ অনুযায়ী তাঁর কাছে গিয়ে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আসতেন।

ওমর ইবনে যারকা বলতেন, আপনার সম্মুখে আমি কিভাবে মুখ খুলতে পারি? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলতেন, এটিই আমার আম্মাজানের নির্দেশ। প্রায়ই এমনও ঘটত যে, বক্তা যখন সেই মাসআলার মীমাংসা করতে অপরাগ হতেন তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে এর ফায়সালা করে দেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করতেন।

ইমাম জননী কখনো নিজে গিয়ে সেই মাসআলার জবাব শুনে আসার আবদার করতেন। তিনি খচ্চরের ওপর আরোহণ করে পথ চলতেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। ইমাম জননী নিজেই মাসআলার বিবরণ পেশ করতেন। আর নিজ কানেই এর জবাব শুনতেন। অন্যথায় তাঁর মন শান্ত হতো না।

ইমাম জননী একদিন বললেন, অমুক মাসআলা সম্পর্কে আমার জানার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। এ অবস্থায় আমি কি করব? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর জবাব দিলেন। ইমাম জননী বললেন, তোমার সনদ নেই। বক্তা যারকার সমর্থন না করলে আমার মন শান্ত হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখন জননীসহ বক্তার খেদমতে গিয়ে সেই মাসআলার বিবরণ পেশ করলেন।



ওমর ইবনে যারকা বললেন, আপনি এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক ওয়াকেফহাল। আপনি এর মীমাংসা করে দেননি কেন? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আমি এ ফাতওয়া দিয়েছিলাম। যারকা বললেন, এটি সম্পূর্ণ সহীহ হয়েছে। ইমাম জননী একথা শুনে শান্ত হলেন। তারপর উভয়ে বাড়ি ফিরলেন।

কুফার গর্ভনর ইয়াযীদ ইবনে ওমর ইবনে হুবাইরা আল-ফারারী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে আহ্বান করে তাঁকে মীর-মুনশি পদে বহাল করতে চাইলেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাঁকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল তখনও ইমাম জননী জীবিত ছিলেন। ইমাম জননী এতে অতিশয় মর্মাহত হলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলতেন, জেল-জরিমানা ও নির্যাতন ভোগে আমার মনের শান্তি বিনষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু আমার প্রতি এমন নৃশংস ব্যবহারে আমার আম্মাজানের বৃদ্ধকালে যে আঘাত পেলেন তা তিনি সামলিয়ে ওঠতে পারবেন কিনা একথা চিন্তা করে আমি বিচলিত হয়ে ওঠতাম।

## কুসুমের মতো মৃদু এবং পর্বতের ন্যায় অটল

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হৃদয়টি ছিল অত্যন্ত কোমল। কারও দুঃখ-কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একদিন তিনি মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, অমুক ব্যক্তি দালানের ওপর হতে পড়ে গেছে। একথা শুনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এমনভাবে আর্তনাদ করে ওঠলেন যে, সারা মসজিদ থর থর করে কাঁপতে লাগল। তখন তিনি খালি পায়ে দৌড়ে গেলেন। সেই বাড়িতে গিয়ে তিনি বহু শোক-আফসোস করলেন। তিনি তাদের প্রতি এমনই সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন যে, সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক দিন সকালে গিয়ে তার হাল অবস্থা জেনে আসতেন।

অথচ নিজের ওপর যখন কোনো বিপদ আসত তখন তিনি ঝড়-ঝঞ্ঝার সাথে মুকাবেলা করার জন্যই যেন তাঁর জন্ম হয়েছে, সেই মনোভাব দেখাতেন। মৃত্যুর গর্জনকে তিনি অমৃতের মতো শুনতেন। উচ্চ রাজ-কর্মচারী ও শাসনকর্তাদের সাথে তাঁর মনোমালিন্য, মন কষাকষি এবং বিরোধিতা লেগেই থাকত। ফলে তাঁকে আজীবন বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তারা জীবনও তাঁর মনোবৃত্তির কিছুই পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি।

শাসনদণ্ড খলীফা আবু জাফর আল-মনসুরের হাতে থাকলেও শাসনকার্য চলতে লাগল কারারুদ্ধ হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর ইচ্ছে ও মর্জি মোতাবেক। খলীফা এটি সহ্য করতে না পেরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে খাদ্যের সাথে বিষ মিশ্রিত করে তাঁর প্রাণহানি করলেন।

একদিন তিনি মসজিদে শিক্ষাদান করেছিলেন। ছাত্র ও ভক্তের দল বিশেষ মনোযোগের সাথে তাঁর উপদেশ মতো পান করছিল। এমন সময় ওপর হতে একটি সাপ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কোলের ওপর পতিত হলো। সকলে তখন ভীত-শঙ্কিত হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে বের হয়ে গেল। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একটুও নড়াচড়া করেননি। ইমাম মালিক (রহ.)-এর জীবনেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। পার্থিব কোনো কিছুতে ভীত-শঙ্কিত হওয়া তাঁর স্বভাব ছিল না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বড় স্বল্পভাষী ছিলেন। বিনাপ্রয়োজনে তিনি কোনো দিন মুখ তাঁর শিক্ষা-মজলিসে ছাত্রবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তর্ক-বিতর্ক করতেন। আর গভীর মনোযোগের সাথে তিনি তা শুনে যেতেন। এমন বিতর্ক-সভা যখন গরম হয়ে উঠত এবং ছাত্রদের দ্বারা এর সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ত তখন তিনি অতিসহজে সমস্যাসমূহের সমাধান করে দিতেন।

## জিহ্বার সতর্কতা

গীবত কোনোদিন তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়নি। আল্লাহ তাঁকে অপবিত্রতা হতে বিমুখ রেখেছেন, এজন্য তিনি অহোরাত্র শুকরিয়া আদায় করতেন। একদিন এক ব্যক্তি বললেন, হযরত! লোকেরা আপনার সম্পর্কে বহুকিছু বলাবলি করে থাকে। কিন্তু আপনার মুখে তো এ সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারিত হতে শুনেনি? তিনি তখন পাক কালামের নিম্নের আয়াতখানি পাঠ করলেন,

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ

'আল্লাহর এ নিয়ামত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাকেন।'[১]

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-কে কোনো এক ব্যক্তি বললেন, আমরা কোনোদিন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে কারও গীবত করতে

[১] (ক) আল-কুরআন, *সুরা আল-মায়িদা*, ৫:৫৪; (খ) আবদুল কাদির আল-কুরাশী, *আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানীফা*, খ. ২, পৃ. ২৯৭



শুনিনি। জবাবে তিনি বললেন, ইমাম আবু হানিফা বোকা লোক নন যে, গীবত করে তিনি নিজেই নিজের নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেবেন।

অনেকে কথায় কথায় কসম খেয়ে থাকে। তিনি এটাকে অত্যন্ত খারাপ জানতেন। এ সম্পর্কে তিনি আপ্রাণ সতর্ক থাকতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ঘটনাক্রমে যদি তাঁর দ্বারা এ ধরনের কোনো ত্রুটি ঘটে যায়, তবে তিনি এর কাফ্ফারা হিসেবে এক দিরহাম দেবেন। ভুলে একদিন তিনি কসম খেয়ে ফেলেছিলেন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আবার যদি আমার দ্বারা এ ধরনের পাপ সংঘটিত হয় তবে এর কাফ্ফারা হিসেবে এক দিরহাম না দিয়ে এক দীনার দেবেন।

## যিক্র ও ইবাদত

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পরম সংসারবিরাগী ছিলেন। যিক্র ও ইবাদতে তিনি মজে থাকতেন? আহ্লাদভরে তিনি এসব কর্তব্য পালন করতেন। এজন্য তিনি বিশ্বচরাচরে চিরআদর্শরূপে বিরাজ করছেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) লিখেছেন, পরহেজগারি ও ইবাদতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। নামাযে ও কুরআন পাঠকালে প্রায়ই তিনি অধীরভাবে কান্না করতেন। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কান্নাকাটির অবস্থায় কেটে যেত।

ইবরাহীম আল-বাসরী বলেন, একদিন ফজরের নামাযে আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে শরীক হয়েছিলাম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নামায পড়লেন, আর আল্লাহকে জালেমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গাফেল জানবে না। তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এমন এক অবস্থায় হলো যে, তাঁর পুরো শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, একটি জরুরি মাসআলার মীমাংসার জন্য আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর খেদমতে গেলাম। আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে ইশার নামাযে শামিল হলাম। তিনি নফল নামায হতে ফারেগ হলে আমি সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি কুরআন পাঠ করতে করতে এ পর্যন্ত পৌঁছে তা বারংবার পাঠ করতে লাগলেন। এভাবে ফজর হয়ে গেল। তবুও তিনি সেই আয়াতই পাঠ করতে লাগলেন।

একবার ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ আয়াত পাঠ করলেন, 'কিয়ামতে পাপীরা স্বীয় কাজের ফল পাবে। কিয়ামত ভয়ঙ্কর মুসীবতের স্থান এবং এটা অসহ্যকর ব্যাপার।' এ আয়াত পাঠ করতে করতে তিনি সারা রাত খতম করে দিলেন। তিনি উক্ত আয়াত বারংবার পাঠ করছিলেন, আর কান্না করছিলেন।

ইয়াযীদ ইবনুল কুমাইত একজন মশহুর আবেদ ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদিন ইশার নামাযে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে শরীক হই। তিনি নামায পড়লেন। লোকেরা নামায পড়ে চলে গেল। আমি সেখানে রয়ে গেলাম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখনও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। তখন তাঁর সম্মুখে থাকা বাঞ্ছনীয় নয় মনে করে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। শেষরাতে মসজিদে গিয়ে দেখি তিনি তখনও মসজিদে চিন্তিত অবস্থায় বসে আছেন।

একদিন তিনি বাজারের মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। একটি বালকের গায়ে হঠাৎ তাঁর পা লেগে গেল। বালকটি চেঁচিয়ে বলে ওঠল, তুমি তো আল্লাহকে ভয় কর না। তা শুনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বেহুশ হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে এক বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন। তিনি হুশ ফিরে পেতে আরম্ভ করলে ওই বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, হযরত! এ কেমন ব্যাপার যে, আপনি একটি বালকের কথায় এমনভাবে বেহুশ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, তা গায়েবি হেদায়তও হতে পারে।

## রোদন প্রবণতা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর অভ্যাস মতো একদিন দোকানে গেলেন। কর্মচারী দোকান খুলে বসেছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে দেখতে পেয়ে কর্মচারী বলল, আল্লাহ আমাদেরকে বেহেস্ত দান করুক! একথা শুনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এমন অবস্থা হলো যে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। তিনি কর্মচারীকে দোকান বন্ধ করতে বলে চেহারার ওপর রুমাল ঢেলে বাজারের বাইরে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন দোকানে গিয়ে কর্মচারীকে বললেন, ভাই! আমি বেহেশত পেতে কামনা করব এমন উপযুক্ততা আমার আছে কি? আল্লাহর আযাবে যদি



নিপতিত না হই তবে তাই যথেষ্ট। হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)ও প্রায়ই বলতেন, কিয়ামতের দিবস যদি আমার প্রতি কোনো ধরপাকড় না হয় এবং আমি কোনো পুরস্কারও না পাই তাতেও যে আমি রাজি থাকব।

## গায়েবি সতর্কতা

একদিন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) জনৈক ব্যক্তিকে মাসআলা বলে দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফাতওয়া দেওয়ার সময় আল্লাহকে যথেষ্ট ভয় করবেন। এ শব্দকয়েকটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করল যে, তাঁর চেহারার রং সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, ভাই! আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন! আমার যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে, আল্লাহ আমাকে এই বলে ধরপাকড় করবেন যে, তুমি ইলম জেনেও কেন তা গোপন করে রেখেছ তবে আমি কস্মিনকালেও ফাতওয়া দিতাম না। এমন কোনো জটিল মাসআলা যদি এসে পড়ত যার জবাব তাঁর জানা থাকত না তবে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠতেন যে, তিনি নিশ্চয়ই কোনো পাপে লিপ্ত হয়ে থাকবেন। বোধহয় এর ফলেই তিনি এর জবাব অবগত নন। এমন আশঙ্কা তাঁর মনে জাগত। তখন তিনি নতুন করে অযু করে নামায ও এসতেগফার পড়তেন।

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (রাযি.) একজন বিখ্যাত সুফি ছিলেন। লোকমুখে তিনি এ কাহিনি শুনতে পেয়ে বহু কান্না করলেন। কান্নাশেষে বললেন, হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর পাপ অতিকম ছিল। এজন্যই তাঁর এমন ধারণা জন্মেছে। যারা পাপে ডুবে থাকে তাদের ওপর শত-সহস্র বিপদ আসে। কিন্তু তারা ভ্রমেও বুঝতে পারে না যে, এটি গায়েবি সতর্কতা।

## প্রাত্যহিক সাধারণ কর্তব্য

তিনি ফজরের নামাযের পরই মসজিদে ছাত্রদেরকে পড়াতে আরম্ভ করতেন। তাঁর কাছে বহু দূর-দরাজ হতে লোকেরা জটিল মাসআলার সমাধান ও ফাতওয়ার জন্য আসত। তিনি মৌখিক বা লিখিতভাবে সকলের জবাব দিতেন। এরপর ফিকহের মজলিস বসে যেত। নামজাদা শাগরিদবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন। সর্বসম্মতিক্রমে যে মাসআলার মীমাংসা হয়ে যেত তা লিপিবদ্ধ হয়ে যেত।

যুহরের নামায পড়ে তিনি ঘরে ফিরতেন। গ্রীষ্মকালে তিনি সর্বদা যুহরের নামাযের পর ঘুমাতেন, আসরের নামাযের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্য চলতে থাকত। অবশিষ্ট সময়ে তিনি বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিলেমিশে রোগীদের দেখা-শোনা এবং গরীবদের সেবায় কাটাতেন। মাগরিবের পর আবার শিক্ষাদান আরম্ভ হয়ে যেত। ইশার নামায পর্যন্ত তা চলতে থাকত।

ইশার নামাযের পর তিনি ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন হতেন। আর প্রায় রাতেই তিনি ঘুমাতেন না। শীতকালে মাগরিবের পরই মসজিদে শুয়ে পড়তেন। আর দশটায় কাছাকাছি সময় তিনি ইশার নামায পড়তেন। আর তাহাজ্জুদ, দরুদ ও অজিফা পাঠে তিনি সারারাত কাটিয়ে দিতেন। আর কোনো সময় দোকানেও বসতেন।

## ঈমানদারি

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একদিন ঘরে বসেছিলেন। তাঁর মেয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আজ রোযাদার। আমার দাঁত হতে রক্ত বের হয়ে থুথুর সাথে গলার ভেতরে ঢুকে গেছে। এতে আমার রোযা বিনষ্ট হয়ে গেছে কিনা?' ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, 'হে প্রিয় বৎস! তুমি তোমার ভ্রাতা হাম্মাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। আমাকে তো ফাতওয়া দিতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (রহ.) এ প্রসঙ্গে লিখছেন যে, আনুগত্য ও আমানতদারির এরচেয়ে অধিক জ্বলন্ত আদর্শ আর কি হতে পারে?

এর অল্পকয়েক দিন পরে গভর্নর বাহাদুর ঘটনাক্রমে ফিকহ-সংক্রান্ত এক জটিল মাসআলার সম্মুখীন হলেন। তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় রইল না। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফাতওয়া দেওয়ার জন্য আবার সাধারণ হুকুম পেলেন।

## ফাতওয়া-সংকট

একদিন সৌভাগ্যক্রমে ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.), কাজী ইবনে আবু লাইলা (রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সমবেত হলেন। জ্ঞান পিপাসুদের জন্য এরচেয়ে অধিক সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারে? এক ব্যক্তি এসে মাসআলা জিজ্ঞাসা যে, কিছুলোক একত্র সমবেত ছিল। হঠাৎ



একটি সাপ বের হয়ে এক ব্যক্তির শরীরের ওপর উঠতে লাগল। সেই ব্যক্তি ঘাবড়ে গিয়ে এটা দূরে নিক্ষেপ করল। সাপ দ্বিতীয় ব্যক্তির শরীরে গিয়ে পড়ল। সেই ব্যক্তিটিও সন্ত্রস্ত হয়ে সাপটি দূরে নিক্ষেপ করল। এভাবে সর্বশেষ লোকটিকে সাপ দংশন করল। লোকটি মরে গেল। এ অবস্থায় দীয়ত (রক্তমূল্য) কাকে দিতে হবে? এর মীমাংসা বড় কঠিন ছিল।

এ সম্পর্কে সকলেই মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন। কেউ কেউ বললেন যে, সকলকেই দীয়ত দিতে হবে। কেউ কেউ বললেন, শুধু প্রথম ব্যক্তি জিম্মাদার হবে। কিন্তু একজনের সাথে অপরজন একমত হতে পারছিলেন না। বহু তর্ক-বিতর্কের পরও কেউই কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কিন্তু আগাগোড়া নীরব রইলেন। পরিশেষে সকলেই তাঁর শরণাপন্ন হলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, যখন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর সাপটি নিক্ষেপ করল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অক্ষতদেহ রইল, তখন প্রথম ব্যক্তি জিম্মাদারি হতে বেঁচে গেল।

সর্বশেষ ব্যক্তিটির ব্যাপার হচ্ছে, তার সম্মুখে দুইটি অবস্থা ছিল। তার প্রতি সাপ-নিক্ষেপকারী এর জন্য দায়ী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যদি তাকে সাপ দংশন করে থাকে তবে সাপ-নিক্ষেপকারীও জিম্মাদারি হতে বেঁচে গেল। এ অবস্থায় যদি সাপ সর্বশেষ ব্যক্তিকে দংশন করে থাকে তবে এটা তার অলসতা যে, সে কেন স্বীয় সংরক্ষণে ক্ষিপ্রতার সাথে তৎপর হলো না। এ সিদ্ধান্তের ওপর সকলেই একমত হলেন। তখন প্রত্যেকেই পঞ্চমুখে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রশংসাগীতি গাইতে লাগলেন।

## দীন ও দুনিয়া

দীন ও দুনিয়া আদৌ পরস্পর বিরোধী নয়, বরং উভয়ই একই বৃত্তের দুইটি ফুলসদৃশ। দুনিয়াকে সুপরিচালিত করার মানসে দীনের আবশ্যক। এ বিশ্বচরাচরের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাঁর আইনের নাম ইসলাম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ সম্পর্কে চির-জাগ্রত ছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্র ও ভক্তদেরকে এ ইসলামি শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে,

اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ۝

'আমাদেরকে ইহ-পরকালে মঙ্গল দান কর।'[১]

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:২০১

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবিতাবস্থায় যদিও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর সাথে রাজ-সরকারের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি তবুও তাঁর ব্যক্তিগত উপযুক্ততা এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিক্ষা উভয়ের সমন্বয়ে তাঁর মধ্যে যে উপযুক্ততা দেখা গিয়েছিল এর কারণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। তাঁকে যা কিছু লিপিবদ্ধ করে দেন তা রাজ্য-পরিচালনায় যথেষ্ট। অপরিসর স্থানের দিক দিয়ে লক্ষ করে এর পূর্ণ বিবরণ প্রদান সম্ভবপর নয়। তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

## কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর হেদায়তনামা

তখনকার শাসন-কর্তৃপক্ষের প্রতি লক্ষ করে বলা হয়েছে যে, বাদশাদের কাছে খুব কম যাতায়াত করবে। মানুষ যেমন আগুন হতে বেঁচে থেকে তুমিও তাদের সংশ্রব দরবারে যাবে না। তাহলে তোমার মান-সম্মান ও গৌরব অটুট থাকবে। আর দরবারে যদি এমন লোকের সমাবেশ থাকে যে, তুমি তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নও তখন সেই দরবার হতে অধিক দূরে থাকবে। কারণ তুমি যখন তাদের মান-সম্মান সম্পর্কে অজ্ঞাত সে অবস্থায় তুমি তাদের প্রতি যে আচার-ব্যবহার করবে এবং তাদের সাথে যে আলাপ-আলোচনা করবে তা তাদের মনঃপূত নাও হতে পারে।

তারা যদি তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদা-সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তুমি যদি তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না কর তবে তারা তোমার সবকিছুকে বদ-তামীযী মনে করবে। আর তারা যদি সাধারণ লোক হয়ে থাকে আর তুমি যদি তাদের প্রতি অযথা ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, তবে বাদশার দৃষ্টিতে তুমি হেয়প্রতিপন্ন হবে।

বাদশা যদি তোমাকে কাজী পদে নিযুক্ত করতে চান তবে তুমি প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে যে, তিনি তোমার ইজতিহাদ-তরীকার সাথে একমত কিনা। যদি তা না হয়ে থাকে এবং তুমি উক্ত পদে নিযুক্ত হও তবে তোমাকে সুলতানের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফাঁদে পড়ে তোমার মতের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে হবে। তুমি যে কাজ বা পদের উপযুক্ত নও তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করবে না।

আর কেউ যদি শরীয়তে বিদআত আমদানি করতে চায়, তবে প্রকাশ্যভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতিকে লোকের চোখের সম্মুখে তুলে ধরবে, তাহলে



অন্য লোক তাদের খপ্পরে পতিত হবে না। তখন তারা কে বা কারা তা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা সত্য প্রকাশ ও সত্যপ্রচারে আল্লাহ তোমার সহায়, তুমি তাঁর দীনের সহায় ও সাহায্যকারী হবেন।

স্বয়ং বাদশার মধ্যে যদি এমন কোনো দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তবে পরিস্কাররূপে বলে দেবে, যদিও কাজী হিসেবে আমি আপনার অধীন, তবুও আপনার ভুল-ত্রুটি সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রচার করা আমার পক্ষে ফরয। বাদশা যদি তা না মানেন, তবে গোপনে একাকী তাকে বলে দেবে যে, আপনার এই কাজ কুরআন মজীদ ও হাদীসে নববীর বিরোধী। বাদশা যদি তা মেনে নেন, তবে তিনি ধন্য হবেন। অন্যথায় তাঁকে বলে দেবে যে আপনাকে সুমতি দান করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা ব্যতীত আমার গত্যন্তর থাকবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পার্থিব জীবনের সবকিছু সম্পর্কে বহু মূল্যবান উপদেশ দান করে গেছেন। তিনি লিখছেন, জ্ঞানার্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করবে। জ্ঞানার্জনের পরে জায়েয তরীকায় জীবিকা-নির্বাহের উদ্দেশ্যে ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করতে হবে। ইলম ও দৌলত একই সময়ে উপার্জন করা যায় না। তারপর বিয়ে করবে, কিন্তু তখনও তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে, অবশ্যই তোমার স্ত্রী-পুত্র লালন পালনের ক্ষমতা রয়েছে। পূর্ব-স্বামীর সন্তান রয়েছে এমন স্ত্রীলোককে বিয়ে করবে না।

জনসাধারণ বিশেষভাবে ধনীদের সাহায্য হতে দূরে থাকবে। অন্যথায় তারা ধারণা করবে যে, তুমি তাদের মুখাপেক্ষী। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা তোমাকে ঘুষ দিতেও সাহস করবে। বাজারে যাওয়া, দোকানে বসা, রাস্তা বা মসজিদে বসে কোনোকিছু খাওয়া ইত্যাদি হতে বেঁচে থাকবে। কেউ কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে শুধু তার উত্তর দেবে, নিজের পক্ষ হতে কিছু বাড়াবে না বা কমাবে না।

আকায়িদ সম্পর্কে সর্বসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনা করবে না। ছাত্রদের সাথে এমন সদয়-সস্নেহ ব্যবহার করতে হবে যে, অপর কেউ দেখলে যেন মনে করে যে, তারা তোমার সন্তান। জনসাধারণ এবং নিম্নস্তরের লোকের সাথে তর্ক-বিতর্ক হতে দূরে থাকবে। কোনো শহরে গেলে সেখানকার আলেম-ওলামাদের সাথে এমনভাবে মিলমিশ করে চলবে তাঁদের মনে যেন বিরোধিতার কোনো প্রশ্নই উদিত না হয়।

ইলম সম্পর্কে কোনো আলাপ-আলোচনা হলে জেনে বুঝেই আলাপ-আলোচনা করবে। তুমি যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারবে না এমন কোনো কথা বলবে না। তর্ক-বিতর্ক সভায় চরম সাহস ও স্থিরতা-ধীরতার সাথে অগ্রসর হবে। অন্তরে বিন্দু-পরিমাণ ভয়ও যদি থাকে তবে ভাব-ধারা স্থির রাখতে পারবে না, আর ভাষাও বলিষ্ঠ এবং সাবলীল হবে না। যারা তর্ক-বিতর্কের আদব-কায়দা জানে না বা অহংকার দেমাগ বাতিকগ্রস্থ তাদের সাথে কখনও তর্ক করবে না। তর্কের সময় রাগান্বিত হতে নেই।

কম হাসবে, অধিক হাসলে অন্তঃকরণ মরে যায়। যেকোনো কাজ করবে সুস্থ দেহ মনে করবে। কোনো লোক সম্মুখে এসে আহ্বান না করা পর্যন্ত জবাব দেবে না। কেননা পেছন হতে শুধু পশুকে আহ্বান করা যায়। রাস্তায় চলার সময় ডানে-বামে চাইবে না। গোসলের ঘাটে গেলে জনসাধারণের সুবিধার প্রতি অধিক নজর দেবে। সকালে বা দ্বিপ্রহরে ঘাটে যাবে না। আলাপ-আলোচনায় কঠোরতা পরিহার করবে।

খুব জোরে কথা বলবে না। কোনো বস্তু ক্রয় করতে হলে নিজে বাজারে না গিয়ে টাকা দিয়ে কিনে আনবে। রাজ-দরবারে কখনও নীরব দর্শক হবে না, প্রতি কথায় ও কাজে বেপরোয়া থাকবে। সাধারণ লোকদের সাথে বসে ওয়ায করবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে বক্তাকে প্রায় ক্ষেত্রেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। শাগরেদকে ফিকহ পড়ার অনুমতি দান করতে হলে নিজে সেই মজলিসে বসে তার উপযুক্ততা সম্পর্কে পরীক্ষা করবে। পরীক্ষা না করে কাউকেও তাতে আদেশ প্রদান করবে না। সে যদি ঘটনাক্রমে ভুল পথে পরিচালিত হয় আর তখনও যদি তুমি চুপ থাক, তবে লোকেরা ধরে নেবে যে, সঠিকই বলছে।

ফিকহ ব্যতীত অন্য কোনো মজলিসে নিজে যাবে না। তোমার বন্ধু-বান্ধব বা শাগরেদকে পাঠিয়ে দেবে। তারা তোমার কাছ হতে সবকিছু জেনে-শুনে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হবে। প্রতি কাজে পরহেজগারি ও আমানতদারির প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি রাখবে। আযানের আওয়াজ কানে প্রবেশমাত্র অবিলম্বে নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে। প্রতি মাসে রোযা রাখার জন্য দুই-চার দিন নির্দিষ্ট করে নেবে।

নামাযের পর প্রতিদিন কিছু নির্দিষ্ট অজিফা পড়বে। কুরআন তিলাওয়াতে গাফিল না হওয়া চাই। দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়বে না।



প্রায়ই কবরস্থানে যাবে। বৃথা আমোদ-আহ্লাদে মাতবে না। পাড়া-প্রতিবেশীর কোনো দোষ দেখলে তা ঢেকে রাখবে। বিদআতীদের সাথে কোনো সংশ্রব রাখবে না। লোকেরা তোমার সাথে দেখা করতে আসলে তাদের সাথে জ্ঞান-চর্চা করবে। সেই ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হয়ে থাকে তবে উপকার লাভ করবে, এতে তোমার সাথে তার ভালবাসা জন্মাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এক শাগরেদকে খলীফার দরবারে আহ্বান করা হলো। তখন তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে পরামর্শ করার জন্য এসে বললেন, আমি খলীফার দরবারে যেতে চাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি কি বলব তা কিছুই আমার বুঝে আসছে না। হযরত! আপনি আমাকে এ সম্পর্কে কিছু উপদেশ দান করুন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, তুমি তাঁকে বললে, হে আমীরুল মুমিনীন! সম্মান, সম্পত্তি ও রাজত্বের জন্য লোকেরা দুনিয়াকে চেয়ে থাকে। আপনার এসব কোনো কিছুরই অভাব নেই। আপনি যদি পরহেজগারি ও নেক আমল এখতেয়ার করেন তাহলে আপনার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলছেন, ইলম যাকে পাপ ও নির্লজ্জতা হতে বিরত রাখেনি তার চেয়ে অধিক হতভাগা আর কেউই নেই। যে ব্যক্তি ইলম-দীন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে এবং তার এমন ধারণা জন্মে যে, তাকে এজন্য সেসবের জবাবদিহি হতে হবে, সেই ব্যক্তি ধর্মের মর্যাদা উপলব্ধি করা দূরের কথা, সে নিজের মূল্যও কিছুই বুঝতে পারেনি।

আলেমগণ যদি আল্লাহর বন্ধু না হয়ে থাকেন তবে এ বিশ্বচরাচরে আল্লাহর কোনো বন্ধু নেই। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নিমিত্ত ইলম শিখে থাকে তার অন্তরে ইলম স্থান পায় না। ঈমানের চেয়ে বড় ইবাদত আর কিছুই নেই। আর কুফরির চেয়ে অধিক পাপ আর কিছুই নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি এ শ্রেষ্ঠ ইবাদতের পায়রবি করে থাকে এবং হীনতম পাপ হতে বেঁচে থাকে সে যতো বড় পাপীই হোক না কেন, একদিন না একদিন তার ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রয়েছে। যে ব্যক্তি হাদীস শিক্ষা করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে না তাকে এমন একজন চিকিৎসকের সাথে তুলনা করা যায় যে, তার কাছে বহু ওষুধপত্র রয়েছে, কিন্তু সে জানে না যে, কোনটি কোন রোগের ওষুধ।

এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ফিকহশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করার জন্য সবচেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় কি? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, একাগ্রতা। সেই ব্যক্তি বললেন, তা কিভাবে সহজলভ্য হতে

পারে? তিনি বললেন, মানুষ শুধু আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ ব্যবহার করবে, এছাড়া বাকি সবকিছু পরিত্যাগ করবে।

একদিন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত মুআবিয়া (রাযি.) সম্পর্কে হুযুর কি বলেন? তিনি বললেন, কিয়ামতের দিবস আমাকে যেসব কথা জিজ্ঞাসা করা হবে সেই সম্পর্কে আমি অধিক ভয় পাই। এ সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, কাজেই এ সম্পর্কে মাথা ঘামাবার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে কেউ যেন এ মতো ধারণা না করে যে, এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কোনো ব্যক্তিগত অভিমত নেই। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) স্বয়ং এ সম্পর্কে বলছেন, হযরত আলী (রাযি.)-এর আদর্শ যদি আমাদের সম্মুখে না থাকত তবে বিদ্রোহীদের সাথে কি রকম আচরণ করা সমুচিত তা আমরা বলতে পারতাম না।

ইমাম শাফিয়ী (রাযি.)ও এ সম্পর্কে একমত। কিন্তু এসবকে ইসলামের একটি জরুরি মাসআলা হিসেবে বিবেচনা করা এবং এর ওপর নিজেদের ইচ্ছামতো মন্তব্য করা একটি অবান্তর কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও এর প্রতি ইশারা করেছেন। কুফার গভর্নর একদিন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে বললেন, হযরত! আপনি আমার কাছ হতে এত দূরে থাকেন কেন? তিনি বললেন, শান্তির সাথে এক টুকরা রুটি এবং মোটা বস্ত্র যদি মিলে যায় তবে তা সেই আরাম-আয়েশ হতে শ্রেষ্ঠ।

## কবিতা আবৃত্তি

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মাঝে-মাঝে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু তা কখনও গযল বা গানের সুরে নয়। তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। অর্থাৎ মানুষ যতোদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে ততোদিন পর্যন্ত একটি উত্তম ঘরের আবশ্যক। এমন একটি ঘর মিলে গেলে তার শুকরিয়া আদায় করা চায়। আর আখিরাতের ঘরের জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা করা প্রয়োজন।

## উপস্থিত বুদ্ধি

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উপস্থিত বুদ্ধি প্রবাদের মতো দেশময় পরিচিত ছিল। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) লিখেছেন, আদম-



সন্তানদের মধ্যে যাঁদের বুদ্ধি অসাধারণ ছিল তাঁদের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)ও একজন ছিলেন। খুব কঠিন সমস্যা উপস্থিত হলে তিনি এত দ্রুত এর সমাধান করে দিতেন যে, লোকেরা অবাক হয়ে যেত। মাসআলা-মাসায়িল সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল হয়তো অনেকে ছিলেন। কিন্তু কোনো প্রকার চিন্তা বা সামান্য একটু দেরি না করেই এর যথাযথ উত্তর দেওয়ার ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এক ব্যক্তি কোনো এককথায় তার স্ত্রীর প্রতি নারাজ হয়ে শপথ করে বলল, তুমি যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে কথা না বল ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি কখনও তোমার সাথে কথা বলবো না। স্ত্রীলোকটির মেজাজও কড়া ছিল। সেও তার স্বামী যা বলেছিল হুবহু তাই বলল। রাগের সময় কেউ তো কোনোকিছু তলিয়ে দেখেনি। এরপর তাদের মেজাজ যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসল তখন উভয়ের মনেই অনুতাপানল জ্বলে উঠল।

স্বামী তখন ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হলো। এর কোনো সুরাহা হয় কিনা তা তলিয়ে দেখার জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে সে বহু কাকুতি মিনতি করল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, যাও, খুব আগ্রহভরে আলাপ কর। এজন্য কাকেও কাফ্ফারা দিতে হবে না।' ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) একথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন।

অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি লোকদেরকে ভুল মাসআলা বলে থাকেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখন সেই ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার ডেকে এনে তাকে ঘটনাটি পুনরায় বলে যেতে আদেশ করলেন। সে তা পালন করল। তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-কে লক্ষ করে বললেন, আমি পূর্বে যা বলেছিলাম, এখনও তাই বলছি।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-এর গূঢ়তত্ত্ব জানতে চাইলে তিনি বললেন, স্ত্রীলোকটি যখন স্বামীকে লক্ষ করে উক্ত কথা বলেছিল তখন স্ত্রীলোকটির পক্ষ হতেই প্রথম কথা বলা শর্ত হয়ে গেল। অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন কথা বলে ফেলল তখন শপথ আর কোথায় রয়ে গেল? ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বললেন, প্রকৃতপক্ষেই উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনার মাথায় যে বুদ্ধি খেলে ততোদূর পর্যন্ত আমাদের কল্পনাও দৌড়ায় না।

## সঙ্কটময় মীমাংসা

কুফায় এক ব্যক্তি মহাধুমধামের সাথে একই সময়ে দুইটি মেয়ের বিয়ে দেয়। শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আলেম-ওলামা নিমন্ত্রিত হলেন। মিসআর ইবনে কিদাম আল-হিলালী (রহ.), হাসান ইবনে সালিহ আল-হামদানী (রহ.), সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও সেই উৎসবে যোগদান করেন। তখনও সকল লোকের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়নি। এমন সময় বাড়িঅলা বেহুশ অবস্থায় ঘর হতে বের হয়ে বলতে লাগলেন, 'গযব হয়ে গেছে।' লোকেরা ব্যাপারটি কি জানতে চাইলে বাড়িঅলা বললেন, মেয়েদের ভুলে বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রী উলট-পালট হয়ে গেছে। মেয়ে যে যুবকের সাথে ছিল সে তার স্বামী ছিল না। এখন উপায় কী?

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বললেন, 'হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর জমানায়ও এমন এক ঘটনা ঘটেছিল। এতে বিয়ে ভেঙে যায় না। অবশ্য উভয়কেই মোহর আদায় করতে হবে। মিসআর ইবনে কিদাম আল-হিলালী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে লক্ষ করে বললেন, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, জামাতা স্বয়ং আমার কাছে আসলে আমি এর জবাব দেব। লোকেরা তাদেরকে ডেকে আনল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উভয়কেই পৃথক পৃথক ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে যে মহিলাটি আপনার সাহচর্যে ছিলেন তিনিই যদি আপনার স্ত্রী হিসেবে পরিগণিত হন তবে আপনি সম্মত আছেন তো? উভয়েই তাতে সম্মত হলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, যে মহিলার সাথে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল। আপনারা প্রত্যেকেই সেই মহিলাকে তালাক দিয়ে দেন এবং বাসরঘরে যে মহিলার সাথে আপনার মিলন হয়েছিল, তাদের সাথে আপনাদের বিয়ে হয়ে যাক।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) যে জবাব দিয়েছেন যদিও তা ফিকহ মোতাবেক সহীহ। কেননা এতে সহবাসের সন্দেহ বর্তমান রয়েছে তবুও এতে বিয়ে ভাঙে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পরিস্থিতি অনুযায়ী যাতে সর্বদিক রক্ষা পায় সেই হিসেবে ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বিবেচনা করেছেন যে, এ অবস্থায় বিয়ে কায়েম থাকলেও তা রুচি-সম্মানের দিক দিয়ে বেখাপ্পা হবে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে স্বামী-স্ত্রী যদি তা মেনেও নেয় তবুও তাদের মধ্যে আন্তরিকতা নাও জন্মাতে পারে। আর দাম্পত্য জীবনের তাই



মূল উদ্দেশ্য। আর এতে মোহর প্রদানও সহজ হবে। এর কারণ হচ্ছে স্ত্রীসহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তখন শুধু অর্ধেক মোহর আদায় করতে হয়।

## একটি হৃদয়গ্রাহী ফাতওয়া

লাইস ইবনে সা'দ (রহ.) মিসরের একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যশ-খ্যাতি ও জ্ঞান-গরিমার কথা শুনেছেন, কিন্তু তিনি তাঁকে কখনও দেখেননি। তিনি সেই সুযোগ অনুসন্ধান করছিলেন। এ অবস্থায় তিনি হজের কাছাকাছি সময় মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে এক সভায় বহু লোকের ভীড় দেখতে পান। একজন লোক সভাপতির আসনের সন্নিকটে আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন আর লোকেরা তাঁর কাছে সমূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে।

এক ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলল, হে ইমাম আবু হানিফা! আমার একটি বদমেজাজি পুত্র আছে, আমি তাকে বিয়ে করালে সে যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। আর বাঁদি যদি খরিদ করে আনি তবে তাকে আজাদ করে দেয়। হযরত! আপনি আমাকে বলে দিন, আমি এখন কোন পথ অবলম্বন করব। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অতিঅনায়াসে বলে দিলেন, আপনি আপনার ছেলেসহ বাজারে যাবেন। আপনার ছেলে যে বাঁদি পছন্দ করে তাকেই আপনি খরিদ করে আপনার ছেলেকে বিয়ে করাবেন।

তখন বাঁদিকে সে আর আজাদ করে দিতে পারবে না। কারণ তখন সে বাঁদির মালিক হতে পারবে না। সে যদি বাঁদিকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনার বাঁদি তখন কিছুতেই আপনার হাত ছাড়া হবে না। ইমাম সা'দ (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আশ্চার্যান্বিত হলাম।

## খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

রবী' নামে এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ঘোর শত্রু ছিল। রবী' খলীফা আবু জাফর আল-মনসুরের অমাত্যবর্গের একজন ছিলেন। একদিন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কোনো কাজে খলীফার দরবারে গেলেন। রবী'ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা মনসুর বললেন, হুযুর! রবী' আমীরুল মুমিনীনের বংশধর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বিরোধিতা করে থাকেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোনো কথার ওপর

শপথ করে এবং দুয়েকদিন পর বলে তবে তা শপথের মধ্যে শামিল হবে এবং তাকে শপথ পূর্ণ করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিলেন। তিনি বললেন, শব্দ যদি শপথের সঙ্গে বলা হয় তবে তা শপথের অংশস্বরূপ বুঝতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, এটা কি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, নাকি শুধু অনুমান মাত্র। তারা বলল, এটা তো শুধু আমাদের অনুমানমাত্র। অন্যথায় তা অনর্থক ও অর্থহীন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! রবী' এ ধারণা পোষণ করেন যে, আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ মূল্যহীন। খলীফা মনসুর বললেন, আপনি কিভাবে তা বলছেন? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আপনার ধারণা হচ্ছে, দরবারে যদি কোনো ব্যক্তি আপনার খিলাফতের দীক্ষা গ্রহণ করে এবং বাড়ি গিয়ে শপথ করে বলে, তখন তার শপথ অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং তার ওপর আইনগতভাবে কোনো ক্ষমতা খাটবে না।

খলীফা মনসুর তা শুনে রবী'কে লক্ষ করে বললেন, আপনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে হাশি-তামাশা করবেন না। তাঁর ওপর আপনার কোনো ক্ষমতা খাটে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন দরবার হতে বের হয়ে আসলেন, তখন রবী' বললেন, আজ তো আপনি আমাকে প্রাণে মারার উপক্রম করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আপনিই বরং আমার প্রতি এমন ধারণা পোষণ করেছিলেন। আমি তো শুধু আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম।

## খারিজিদের দুর্ব্যবহার

একদিন বহুসংখ্যক খারিজি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করল। তারা বলতে লাগল, আপনাকে এখন কুফরি হতে তওবা করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনাদের কুফরি হতে তওবা করছি। খারিজিদের বিশ্বাস এই ছিল যে, মানুষ পাপ করলে কাফির হয়ে যায়। অর্থাৎ পাপ ও কুফরি সমান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে আপনারা কুফরি মনে করে থাকেন আমি তা হতে তওবা করছি।

কোনো এক ব্যক্তি খারিজিদের কাছে গিয়ে বলল যে, আবু হানিফা আপনাদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে এসব বলছেন।



খারিজিরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে কৈফিয়ত চাইল যে, তিনি কেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলছেন? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, এ অবস্থায় স্বয়ং আপনাদেরকে তওবা করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেন,

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۝

'নিশ্চয় অধিকাংশ অনুমান পাপ ব্যতীত আর কিছুই নয়।'[১]

একদিন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। বহু শাগরেদ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। হঠাৎ একদল খারিজি সেই মসজিদে ঢুকে পড়ল। লোকেরা পালিয়ে যেতে শুরু করল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাদেরকে বললেন, আপনারা ভয় পাবেন না। আপনার শান্তির সাথে বসে যান। তখন এক খারিজি নেতা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পাশে এসে বসল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখন কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۝

'অংশীবাদীদের কেউ যদি আশ্রয় চায় তবে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। এরপর তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছায়ে দাও।'[২]

খারিজিরা নিজদেরকে ব্যতীত সকল মুসলিম জাতিকে অংশীবাদী ও কাফির হিসেবে বিবেচনা করত। আর তাদেরকে নিহত করা পরম পুন্যের কাজ মনে করত। সুতরাং তারা এই উদ্দেশ্যে এসেছিল যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যদি স্বীয় আকীদার বিবরণ দেন তবে তাঁর ওপর তারা কুফরির অপবাদ দেবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দাঁতভাঙা উত্তর তাদের সবকিছু পরিশ্রমকে পণ্ড করে দেয়। তখন তাদের নেতা তাদেরকে বলল যে, তাঁকে কুরআন পাঠ করে শোনাও এবং তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।

## আরও একটি ঘটনা

আবুল আব্বাস নামে খলীফা আবু জাফর আল-মনসুরের দরবারে একজন উচ্চপদস্থ মহাসম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-হুজারাত*, ৪৯:১২

[২] আল-কুরআন, *সুরা আত-তাওবা*, ৯:৬

(রহ.)-এর সাথে ঘোর বৈরি ভাব পোষণ করতেন। তিনি সর্বদাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনিষ্ট চিন্তা করতেন। একদিন কোনো একটি কাজ উপলক্ষে তিনি খলীফার দরবারে গেলেন। ঘটনাক্রমে আবুল আব্বাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লোকের সাথে বলাবলি করতে লাগলেন যে, আজ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আর রক্ষা নেই।

অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে লক্ষ করে বললেন, হে আবু হানিফা! আমীরুল মুমিনীন আমাদেরকে আদেশ করে থাকেন যে, লোকটি প্রকৃতপক্ষেই দোষী কিনা। এ অবস্থায় আমাদের সেই আদেশ পালন করা উচিত কিনা? তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আপনারা যদি বুঝতে পারেন যে, খলীফা অন্যায় আদেশ করছেন তবে তা মান্য করবেন না। খলীফা মনসুরের সম্মুখে কার এমন কথা বলার শক্তি রয়েছে যে তা নাজায়েয। আবুল আব্বাসকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো যে, খলীফা ন্যায় আদেশই করে থাকেন।

এক ব্যক্তি কসম খেল, আজ যদি আমি ফরয গোসল করি, তবে আমার বিবি তিন তালাক হয়ে যাবে। এর কিছুক্ষণ পরে বলল, আজ যদি আমার স্ত্রী কোনো নামায কাযা করে,তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে। আবার বলল, আজ যদি আমার স্ত্রী আমার সাথে সহবাস করে তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে। আবার বলল, আজ যদি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করি তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে।

লোকেরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে এসে এ সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, আজ আসরের নামায পড়ে সে যেন স্ত্রী-সহবাস করে আর সূর্যাস্তের পর গোসল করে যেন অবিলম্বে মাগরিবের নামায পড়ে লয়। এ পথ অবলম্বন করলে তার সব শর্ত আদায় হয়ে যাবে। সেই ব্যক্তি উক্ত সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করল, নামাযও কাযা হলো না, ফরয গোসলও হয়ে গেল।

একদিন এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে এসে বলল, আমি সতর্কতার সাথে এক জায়গায় টাকা রাখছিলাম। কিন্তু তা কোথায় রাখছিলাম এখন আমার মনে পড়ছে না। আমি এখন ভীষণ বিপাকে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, আপনি এর কোনো প্রতিকার করে দিন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, ভাই! এ মাসআলা তো ফিকহশাস্ত্রে নেই। কাজেই তুমি আমার কাছে কি জিজ্ঞাসা করতে এসছো? সেই ব্যক্তি তবুও



বাড়াবাড়ি করলে তিনি বললেন, তোমাকে আজ সারারাত নামায পড়তে হবে।

ওই ব্যক্তি তখন নামায পড়া শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তার স্মরণ হলো যে, সে অমুক স্থানে টাকা রেখেছিল। সে তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, হযরত! আপনার চেষ্টা সফল হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটা কি শয়তানের সহ্য হতে পারে যে, তুমি সারারাত নামায পড়বে? এজন্যই সে তোমাকে শীঘ্রই তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তবুও এর শুকরিয়া স্বরুপে সারারাত নামায পড়ে কাটিয়ে দেওয়া তোমার উচিত ছিল।

## উদারতা

একদিন এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কিছু জিনিপত্র ঘরের কোনো এক কোনায় পুঁতে রেখেছিলাম। কোন স্থানে আমি তা গেড়ে রেখেছিলাম এখন স্মরণ হচ্ছে না। এখন উপায় কি? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, তোমার যখন স্মরণ নেই, এ অবস্থায় আমার স্মরণ হওয়া কি সম্ভাবনা রয়েছে?

লোকটি কাঁদতে আরম্ভ করল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি তখন কতিপয় ছাত্রকে নিয়ে সেখানে গেলেন। তারপর প্রত্যেককে বললেন, আচ্ছা! এটা যদি তোমাদের হতো এবং হেফাজতের জন্য যদি তোমরা কোনো বস্তু গোপন করে রাখতে তবে তোমরা তা কোথায় লুকায়ে রাখতে? তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, এসব স্থানের মধ্যে নিশ্চয়ই তিন চারটি স্থানের কোনো না কোনো স্থানে বস্তুগুলো গর্ত করে রাখা হয়েছে। তিনি সেসব স্থানে খুঁড়তে আদেশ দিলেন। আল্লাহর কি কুদরত তৃতীয় স্থান খুঁড়িয়ে সবগুলো বস্তু পাওয়া গেল।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যদিও অত্যন্ত গম্ভীর, বুদ্ধিমান এবং মহামান্য ব্যক্তি ছিলেন, তবুও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে তিনি মাঝে-মাঝে হাসি-তামাশাও করতেন। একদিন তিনি চুল কাটতে গিয়ে নাপিতকে বললেন, সাদা চুল তুলে ফেল। নাপিত বলল, আমি সাদা চুল যতো তুলি ততোই আরও বেশি বের হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, এটাই যদি হয়ে থাকে, তবে কাল চুল তুলতে থাক তখন কালো চুল অধিক হয়ে যাবে। কাজী শরীফ এ গল্প

শুনে বললেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নাপিতের সঙ্গেও কিয়াস বর্জন করেননি।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মহল্লায় এক আটা পেষণকারী থাকত। সে গোঁড়া শিয়া ছিল। তার দুইটি খচ্চর ছিল। সে সখ করে একটি নাম 'আবু বকর' এবং অপরটির নাম 'ওমর' রেখেছিল। ঘটনাক্রমে একটি খচ্চর অপর খচ্চরকে লাথি মারলে খচ্চরটি মরে গেল। মহল্লায় এ সম্পর্কে বলা-বলি আরম্ভ হলো। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তা শুনে বললেন, তোমরা গিয়ে দেখ যে, শিয়া ব্যক্তি যে খচ্চরের নাম 'ওমর' রেখেছিলেন সেই খচ্চরই লাথি মেরে থাকবে। লোকেরা অনুসন্ধান করে বাস্তবক্ষেত্রেও তাই দেখতে পেল।

কুফায় এক শিয়া থাকত। সে হযরত উসমান (রাযি.)-কে ইহুদি বলত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একদিন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি যদি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাও তবে অমুক একটি পাত্র আছে সৎবংশজাত, অবস্থাপন্ন এবং পরহেজগার। সারারাত জাগরণকারী ও হাফিযুল কুরআন।' শিয়া ব্যক্তি বলল, তার চেয়ে উত্তম পাত্র আমি কোথায় পাব? আপনি আশা করি এই বিয়ে ঠিকঠাক করে দেবেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, তবে একটা কথা হচ্ছে, সে ইহুদি ধর্মাবলম্বী।

একথা শুনে সেই ব্যক্তি মহাঅসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! আপনি কি আমাকে ইহুদির সাথে আত্মীয়তা করার মত দিয়েছেন? তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, এতে যদি তোমার ঘোর আপত্তি থেকে থাকে তবে কি তুমি বলতে চাও যে, বিশ্বনবী (সা.) তাঁর দুই দুইটি মেয়েকে একজন ইহুদির কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন? আল্লাহর কি কুদরত, এতটুকু কথাতে সেই লোকটি সতর্ক হয়ে গেল। সে তখন পূর্বের মতের পরিবর্তন করে তওবা করল।

## ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর গ্রন্থাবলি, চিন্তাধারা ও গবেষণা

তিনি *ফিকহুল আকাবর* ও *আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

### ফিকহুল আকবর

এটি ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বিষয়বস্তু ও শব্দ-বিন্যাসের দিক দিয়ে এটা, আকায়িদে নাসাফী সমজাতীয় গ্রন্থ। এটি সর্বত্রই বিভিন্ন কুতুবখানায় পাওয়া যায়। ইমাম মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বাহাউদ্দীন (রহ.),



ইমাম ইলিয়াস ইবনে ইবরাহীম আস-সীনাওয়াবী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাগনীসাওয়ী (রহ.), ইমাম হাকীম ইসহাক আর-রুমী (রহ.), ইমাম আকমল উদ্দীন আল-বাবরতী (রহ.) ও ইমাম মোল্লা আলী আল-কারী প্রমুখ মহাত্মাগণ *আল-ফিকহুল আকবর* কিতাবের ব্যাখ্যা লেখেন।

স্থানে স্থানে পাণ্ডুলিপি আকারে ও ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। হিজরী ৯১৮ সালে ইমাম হাকীম ইসহাক আর-রুমী (রহ.)-এর ব্যাখ্যাকে ইমাম আবুল বাকা আল-আহমদী (রহ.) কবিতা আকারে প্রকাশ করেন। আর মূল কিতাবকে ইবরাহীম ইবনে হাসসান আল-কিরমানী (রহ.) কবিতাকারে রূপ দেন। এটি *আশ-শরীফী* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

যদিও ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাওয়ী (রহ.), বাহরুল উলুম মাওলানা আবদুল আলী (রহ.) ও *আল-ফিকহুল আকবর*-এর অন্যান্য ব্যাখ্যাকারীগণ *আল-ফিকহুল আকবর* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর লিখিত বলে উল্লেখ করেছেন, তবুও এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, উক্ত কিতাব যে সময়ে লিখিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ তখন মুদ্রণকাজ প্রচলিত হয়নি।

এতে দর্শনে পরিপূর্ণ বহু শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অথচ সেই সময় পর্যন্ত ভাষার মধ্যে সেসব শব্দ স্থান পায়নি। এটি নিঃসন্দেহে যে, আব্বাসী জমানায় ইউনানি ভাষার দর্শনের কিতাবসমূহ অনুবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই যুগ ছিল ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শেষ জীবনের যুগ।

মোটকথা কিছুতেই অনুমান করা চলে না যে, তখনই এসব অনুবাদ হয়ে গিয়েছিল। আর এসব শব্দ এত দ্রুত প্রচারিত হয়েছিল যে, সাধারণ পুঁথি-পুস্তকেও তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এভাবে এসব শব্দের বহুল ব্যবহারের ফলে তা ভাষারই একটা অংশে পরিণত হলো। তখন সাধারণ আলাপ-আলোচনায়ও সেসব শব্দ ব্যবহার না করে কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানার পর এসব চর্চা আরম্ভ হয়।

অনুভূতির ভিত্তিতে এসব আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু রিওয়ায়াতের ধারানুযায়ী এটি প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থ শতাব্দীর কিতাবসমূহেও এর কোনো আভাস পাওয়া যায় না। পূর্বকালের যেসব কিতাবে এর উল্লেখ রয়েছে এর মধ্যে ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাওয়ী (রহ.)-এর *কিতাবুল উসুল* উল্লেখযোগ্য। এটি পঞ্চম শতাব্দীর লিখিত হয়েছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অসংখ্য ছাত্র ছিলেন। তাঁদের অনেকেই উপযুক্ত শিক্ষক হন। তাঁদের শিক্ষার ফলে অসংখ্য লোক শিক্ষার আলোপ্রাপ্ত হন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর লিখিত কোনো কিতাব যদি থাকত তবে এটি কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে না যে, এত অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে একজনের মধ্যেও এর কোনো উল্লেখ শোনা যায়নি! ইলমে আকায়িদ এবং এ সম্পর্কিত *আস-সহায়িফ*, *শরহুল মাকামা* ও *শরহুল মাওয়াকিফ* ইত্যাদি বড় বড় কিতাব লিখিত হয়েছে। সেসব কিতাবেও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পর এ কিতাবের সবকিছু শরাহ লিখিত হয়েছিল। কিতাবুর রিজালে এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীন কঠোর মন্তব্য করছেন। কিন্তু তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই এমন সন্দেহযুক্ত কিতাব যা শুধু ইমাম আবু মুতী' আল-বলখী (রহ.)-এর রিওয়ায়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ তা মুহাদ্দিসদের উসুল অনুযায়ী গ্রহণ করা যেতে পারে না।

## আমল ও ঈমান

সাহাবায়ে কেরামের সময় পর্যন্ত আকায়িদ সম্পর্কে কেউ কোনোদিন কেনো প্রশ্ন তোলেনি। এ সম্পর্কে তখন কোনো আন্দোলনের নাম-গন্ধও পাওয়া যায়নি। আরবরা এ সম্পর্কে কোনো গবেষণাও করেননি। মধ্যযুগে বনি উমাইয়াদের সামরিক শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্র যখন অধিক প্রশস্ত হয়ে পড়ে এবং শতাবিধ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন ন্যায়পরায়ণতার প্রতি ততো সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হলো না। আরবের বাইরের লোকেরাই এ সম্পর্কে অধিক অগ্রসর হলো অথবা যেসব আরবদের ওপর আজমীদের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল, তারাও এ সম্পর্কে অগ্রসর হলো না। তখন ইসলামের পতনের যুগ ছিল।

ধর্মীয় দলসমূহের মধ্যে আরববদের সাথে যাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদের মন পীড়িত হয়ে ওঠল। তখন মুহাদ্দিসীন ও ফকীহবৃন্দ বিদআতীদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। সেই অভিযানে বুযুর্গদেরকে পর্যন্ত কোনো একপক্ষ অবলম্বন করতে হলো। কিন্তু তাদের বিরোধিতায় ন্যায়ের সীমা রক্ষা করা অনেকের সম্ভবপর হলো না।

মু'তাযিলা নামে এক দল ছিল। তারা বলতো যে, কুরআন মজীদ আল্লাহ তাআলার এক নতুন কালাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) নুবুওয়াতের সঙ্গে সঙ্গে এর



ভিত্তি পত্তন হয়। লোকেরা তাদের বিরোধিতায় এমন ওঠে পড়ে লেগে গেল যে, কোনো মুহাদ্দিস কুরআন শরীফের উচ্চারণকেও কদীম বলে প্রমাণ করলেন।

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এক উস্তাদ তাঁর প্রতি এমন অসন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-কে শিক্ষা-মজলিস হতে বের করে দিলেন। আর সর্বসাধারণের মধ্যে এমন ঘোষণাও প্রচার করলেন যে, যেসব লোক ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কাছে যাওয়া-আসা করবে তাঁর দরবারে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বয়ং কুরআনকে কদীম বলে মনে-প্রাণে মানতেন। কিন্তু কিরাআতকে কদীম বলে মানতেন না। তাঁর উস্তাদ উভয়কেই কদীম বলে মানতেন।

মাসআলা-মাসায়িল সম্পর্কেও এ ধরনের বহু আলোচনা চলছিল, এখানে সেই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যেখানে যে সত্যটুকু পেতেন তাই গ্রহণ করতেন। আর বাস্তব ক্ষেত্রেও এ সম্পর্কে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। অন্যান্য মাসআলার ন্যায় ঈমান এবং আমল সম্পর্কেও লোকের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ ছিল।

মুরজিয়াদের মতবাদ এই ছিল যে, ঈমান ও আমল পৃথক বস্তু। আর ঈমান ও সত্যকে যদি পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করা হয় তবে আমল না করলেও কোনো ক্ষতি নেই। কোনো ব্যক্তি যদি অন্তরের সাথে তওহীদ ও নুবুওয়াতকে স্বীকার করে নেয় এবং ফরযসমূহ আদায় না করে তবে তাকে এর জন্য জবাবদিহি হতে হবে না। এ মতবাদের প্রথমাংশ তো ঠিক, কিন্তু মুহাদ্দিসীন এর কোনো তারতম্য করেননি। তাঁরা সবকিছু সম্পর্কে সেই দলের বিরোধী হয়ে গেলেন।

## ঈমান ও আমল দুইটি পৃথক বস্তু

এ মাসআলাটি অমুকের বা অমুক দলের ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে এমন কোনো প্রশ্ন ছিল না। তিনি সবকিছুতেই প্রকৃত ঘটনা দেখতেন এবং মূল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। ঈমান ও আমলের প্রশ্ন যখন তাঁর সম্মুখে পেশ করা হলো তখন তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করলেন যে, ঈমান ও আমল দুইটি পৃথক পৃথক বস্তু। আর উভয়ের হুকুমও পৃথক পৃথক। একথা শুনে বহু লোক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কেও মুরজিয়া বলত। আর মুহাদ্দিসীন ও

ফকীহদের মধ্যে যাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে সমভাবাপন্ন ছিলেন তাঁদেরকেও লোকেরা মুরজিয়া বলতো।

## মুরজিয়া-বিভ্রাট

মুহাদ্দিস ইবনে কুতাইবা আদ-দীনাওয়ারী (রহ.)-এর বিখ্যাত ও বিশ্বাসযোগ্য *মাআরিফ*-এ যেসব ব্যক্তিকে মুরজিয়া বলে লোকসমাজে প্রচার করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যেসব মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদ ছিলেন নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হলো। যথা– ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আত-তাইমী (রহ.), আমর ইবনে মুর্‌রা আল-মুরাদী (রহ.), তালক ইবনে হাবীব আল-আনাযী (রহ.), হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.), আবদুল আযীয ইবনে আবু দাউদ (রহ.), আবদুল হাদীম ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবু দাউদ (রহ.), খারিজা ইবনে মুসআব আয-যুবাযী (রহ.), আমর ইবনে কায়স আল-মাসির (রহ.), আবু মুআবিয়া আয-যারীর (রহ.), ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়িদা (রহ.), ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.), মুহাম্মদ ইবনুস সায়িব ও মিসআর ইবনে কিদাম আল-হিলালী (রহ.) প্রমুখ।[১]

তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই হাদীস ও রিওয়ায়াতের ইমাম ছিলেন। *সহীহ আল-বুখারী* ও *মুসলিম শরীফে* তাঁদের অসংখ্য রিওয়ায়াত মজুদ রয়েছে। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) লিখছেন, বহু খ্যাতনামা আলেমকেও অনেকে মুরজিয়াভুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁদের ওপর বিন্দুপরিমাণ দোষারোপ করবার কারও অধিকার নেই। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে তাঁরা মুরজিয়াভুক্ত করতে লজ্জাবোধ করেননি।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, আমলকে ঈমানের অংশ বলা চলে না। কেননা আমলকে যদি ঈমানের অংশ বলা হয় তবে যে ব্যক্তি আমলের পাবনিন্দা করে না তাকে মুমিনও বলা চলে না। উদাহরণস্বরূপ খারিজিদের উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা পাপীদেরকে কাফির বলে থাকে। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রাযি.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-কে সর্বান্তকরণে সমর্থন করতেন। তিনি তাঁর কিতাবে লিখছেন, লোকেরা ইমাম শাফিয়ী (রহ.) সম্পর্কে অভিযোগ করে যে, তিনি ত্রুটিপূর্ণ কথার সমর্থনকারী। তিনি বলে থাকেন যে, স্বীকার করা ও আমলের

[১] ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, *আল-মাআরিফ*, পৃ. ৬২৫



সমন্বয়ের নাম ঈমান। সেই সঙ্গে তিনি এও বলে থাকেন যে, আমল না করলে কেউ কাফির হয় না।

অথচ সমষ্টিগত কোনো এক বস্তুর কোনো একটি অংশ যদি না থাকে তবে তা আর মিশ্রিতদ্রব্য থাকে না। এজন্য মু'তাযিলাগণ বলে থাকে, আমল না থাকলে ঈমানও থাকে না। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর পক্ষ হতে এতটুকু বলা চলে যে, স্বীকার এবং বিশ্বাসই আসল ঈমান। আর আমল ঈমানের ফলস্বরূপ এবং এর অনুসরণকারী। কিন্তু যেহেতু অনুসৃত বস্তুর প্রতিও মাঝে-মাঝে বাহ্যিকভাবে আসল বস্তুর সম্পর্ক হয়ে থাকে, এজন্য সেই নিয়ম অনুযায়ী আমলের সাথেও ঈমানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে। আর এও সর্বসম্মত যে, অনুসরণকারী বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে আসল বস্তু বিনষ্ট হয় না।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) তা মীমাংসা করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, হয় আমলকে ঈমানের অনুসরণকারী বলে গণ্য করতে হবে, না হয় একথা মেনে নিতে হবে যে, যে ব্যক্তি আমলের পাবন্দ নয় সে মুমিনও নয়। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি লিখিত মীমাংসা মজুদ রয়েছে। এসব যুক্তি-তর্ক ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, সময়ের প্রতি তাঁর কি রকম উদার ও দূরদৃষ্টি ছিল। তাতে মূল সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। কাজেই এখানে উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি।

ইমাম উসমান আল-বাত্তী (রহ.) সেই জমানার একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছে একখানা চিঠি লিখছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর যে জবাব দিয়েছিলেন তা নিম্নে লিপিবদ্ধ হলো। জনসাধারণের মধ্যে যখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ভাবধারা সম্পর্কে সমালোচনা চলছিল তখন ইমাম উসমান আল-বাত্তী (রহ.) বন্ধুভাবে একটি পত্র দেন।

এর মর্ম এই ছিল, লোকেরা আপনাকে মুরজিয়া বলে থাকে। আর প্রচার করে থাকে যে, আপনি মুমিনীনদের পথভ্রান্তিকে জায়েয বলে থাকেন। এসব কথা শুনে আমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে। এসব কথা কি সত্য? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সেই চিঠিতে বন্ধুর প্রতি শুকরিয়া আদায় করেছেন। আর এতে বহু উপদেশও রয়েছে। প্রয়োজনমতো কিছু কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে এখানে।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পত্র

আপনার অবগতির জন্য আমি লিখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলাম প্রচার করার পূর্বে সকলে অংশীবাদী ছিল। তাঁর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তিনি লোকদেরকে আহ্বান জানালেন যে, তোমরা এক আল্লাহকে মানবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) যা নিয়ে এসেছেন, তা শিরোধার্য করে নেবেন। এ অবস্থায় যারা ইসলাম কবুল এবং অংশীবাদীতা পরিত্যাগ করল, তাদের জান-মাল মুসলমানের জন্য হারাম হয়ে গেল। অতঃপর যারা ঈমান আনল শুধু তাদের ঘাড়ের ওপর কতগুলো কর্তব্য চেপে বসল। কাজেই সেই কর্তব্য পালন একটি কাজে পরিণত হলো। আল্লাহও সেই ইশারা দিয়ে বলছেন,

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۝

'যারা ঈমান আনছে এবং সৎকাজ করছে।'[১]

وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا ۝

'যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।'[২]

এ জাতীয় আরও বহু আয়াত রয়েছে, যা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি আমল না করলে তার ঈমান যাবে না। অবশ্য স্বীকৃতি ও বিশ্বাস যদি না থাকে তবে মুমিন বলে পরিগণিত হবে না। আমল ও ঈমান এক নয়। কাজেই স্বীকৃতির দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে মুসলমান বরাবরই থাকবে। কিন্তু আমলের তারতম্যে মর্যাদার পার্থক্য ঘটে থাকে। দীন ও ধর্ম সকলেরই এক। আল্লাহ স্বয়ং বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۝

'তোমাদের জন্য এই ধর্মকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। নুহকেও এজন্য অসিয়ত করেছি আর যা তোমার কাছে ওয়াহী হিসেবে প্রেরণ করছি এবং যা দ্বারা হযরত ইবরাহীম ও মুসা ও ঈসাকেও অসিয়ত করেছি, তা হচ্ছে, দীনকে কায়েম রাখবে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করবে না।'[৩]

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:২৫
[২] আল-কুরআন, *সুরা আত-তাগাবুন*, ৬৪:৯
[৩] আল-কুরআন, *সুরা আশ-শূরা*, ৪২:১৩



আপনি জেনে রাখবেন যে, স্বীকৃতিও হেদায়েতের একটি অংশ এবং আমলও হেদায়েতের একটি অংশ। অথচ এর প্রত্যেকটিই পৃথক। এমন লোক যে ফরায়িয সম্পর্কে অনবগত তাকে মুমিন বলা যায়। ফরায়িযের দিক দিয়ে লোকটি মূর্খ এবং স্বীকৃতির দিক দিয়ে মুমিন। আপনি কি সেই লোক যে আল্লাহ ও রাসূলের পরিচয় লাভ সম্পর্কে পথভ্রষ্ট তাকে সেই লোকের বরাবর ভাবছেন যে মুমিন কিন্তু আমল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়? এ সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন,

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۝

'এজন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা পথভ্রান্ত না হও।'[১]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۝

'একজন ভুলে গেলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে।'[২]

হযরত মুসা (আ.)-এর জবানে উচ্চারিত হয়েছিল,

فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

'অনন্তর আমি যখন তা করেছিলাম, তখন আমি পথভ্রান্ত ছিলাম।'[৩]

এ দাবি প্রমাণ করার জন্য অকাট্য দলীলস্বরূপ এসব আয়াত ব্যতীত আরও বহু আয়াত রয়েছে। এ সম্পর্কে অধিক স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান হাদীসের অভাব নেই। হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.)-কে আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এজন্য এর অর্থ কি? তাঁরা শুধু সেসব লোকের আমীর যারা ফরয কতর্ব্যাবলি ও আমল পালন করে থাকেন? শাম দেশের যেসব অধিবাসী হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে লড়াই করেছিল তিনি তাদেরকেও মুমিন বলছেন। খুনের চেয়ে অধিক পাপ আর কি হতে পারে?

এক কেবলাঅলা সব মুমিন। আর ফরয তরককারীরা কাফির হয়ে যায় না। যে ব্যক্তি ঈমানের অন্তর্গত সকল ফরয আদায় করে সেই ব্যক্তি মুমিন এবং বেহেশতি। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও শরীয়তের বিধান উভয়কে তরক

[১] আল-কুরআন, *সুরা আন-নিসা*, ৪:১৭৬
[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:২৮২
[৩] আল-কুরআন, *সুরা আশ-শুআরা*, ২৬:২০

করে সেই ব্যক্তি কাফির এবং দোযখী। আর যার ঈমান রয়েছে অথচ তার ফরয তরক হয়ে যায় সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুসলমান, কিন্তু পাপী মুসলমান। তাকে যাকে শাস্তি দেওয়া বা ক্ষমা করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ সম্পর্কে যে রকম সুচারুরূপে মীমাংসা করেছেন এরচেয়ে অধিক মীমাংসা আর কিছুই হতে পারে না। তিনি ফরয-কর্তব্য পালন এবং ঈমানের পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন। এরচেয়ে উত্তম আর কি প্রমাণ হতে পারে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল! তখন ফরয কর্তব্যাবলির অস্তিত্ব ছিল না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ সম্পর্কে যেসব আয়াত পেশ করছেন তা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, এসব পৃথক বস্তু।

এসব অকাট্য দলীলের পাশাপাশি কতিপয় আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কিন্তু সেসব দাবি সমর্থন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে মুমিন মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার ও চুরি করতে পারে না। আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি যে, ভালো লোক এ রকম কাজ করতে পারে না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটি ভদ্রতার খেলাপ। এটি নিঃসন্দেহ যে, ব্যভিচার ও চুরি ঈমানের মর্যাদার উপযুক্ত নয় এবং হাদীসের মর্মও তাই। হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীস সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে,

«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْـجَنَّةَ».

> ‘যে ব্যক্তি বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে বেহেশতী হবে (যদিও সে ব্যভিচারী ও চোর হয়ে থাকে)।’[১]

## ঈমান কম-বেশি হওয়া

দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে, ঈমান কম-বেশি হয় না। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। অনেকে এর অর্থ ভুল বুঝে থাকে। আর এ সম্পর্কে বহু বিতর্ক রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহকে বললেন,

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی ؕ قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیَطْمَىٕنَّ قَلْبِیْ ؕ

[১] আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ৪৪৫



> ‘হে আল্লাহ! তুমি মৃতকে কিভাবে জীবিত করে থাকে? তখন আল্লাহ বললেন, তা কি এখন পর্যন্ত তোমার বিশ্বাসে আসেনি? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এটি আমার বিশ্বাস হয়েছে, কিছু আমার হৃদয়কে অধিক আশ্বস্ত করার জন্য।’[১]

আল্লাহ কয়েকটি আয়াতে এটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ‘ঈমানের উন্নতি সাধন হয়ে থাকে’ শব্দ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যক্তি আমলের পাবন্দি করে সে অধিক মুমিন, যে পাপী সে কম মুমিন। মুহাদ্দিসীন তাঁদের এই মতের সমর্থনে আরও দলীল পেশ করছেন। ইমাম আহমদ আল-কাস্‌তাল্লানী (রহ.) *সহীহ আল-বুখারী*র শরাহে লিখছেন,

أَنَّ الْإِيْمَانَ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْـمَعْصِيَةِ.

> ‘সাওয়াবের কাজ করলে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ করলে হ্রাস পায়।’[২]

এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যায় যেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ঈমানের বৃদ্ধি হ্রাসকে স্বীকার করছেন না। তাঁর ধারণা হচ্ছে, আমল যখন ঈমানের অংশ নয়, কাজের এর হ্রাস-বৃদ্ধিতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। হাদীস শরীফে এসেছে,

> ‘তোমাদের ওপর যে আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা নামায-রোযার আধিক্যে নয়, বরং তাঁর অন্তরে যা কিছু রয়েছে তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।’[৩]

## ঈমানের দিক দিয়ে সকলই সমান

মূল ঈমানে কোনো পার্থক্য নেই, একথায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ বিশ্বাসের দিক দিয়ে সকলই মুসলমান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এই যুক্তির কোনো সনদ নেই। সনদ না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলছেন, আমাদের ও সাহাবায়ে কেরামের ঈমান বরাবর। এর অর্থ হচ্ছে, বহু ব্যাপারে আমরা এবং সাহাবায়ে কেরামের

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:২৬০
[২] আল-কাস্‌তাল্লানী, *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৮৬
[৩] মোল্লা আলী আল-কারী, *শরহুল ফিক্‌হ আল-আকবর*, পৃ. ১৪৪–১৪৫

বরাবর। তবুও আমাদের ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ সম্পর্কে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে।

এ জাতীয় সমগ্র মাসআলাসমূহে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিশেষ রায় রয়েছে। কিন্তু সেই বিভিন্ন মতবাদের দরুণ তিনি কারও বিরুদ্ধে কুফর ও ফুসুকের অভিযোগ করেননি। এ উদারতা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি বৈশিষ্ট্য। ইসলামের স্বর্ণযুগের পর এ ধরনের উদারতা অতিবিরল। এ উদারতার বিপরীত মতবিরোধের ন্যায় অপর কোনো কিছুই ইসলামের এতো মারাত্মক ক্ষতি করেনি।

অবশ্য একথা সত্য যে, সাহাবায়ে কেরামের জমানাতেই এটা শুরু হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং অন্যান্য বহু সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রাযি.) খুব জোরে-সোরে এর প্রতিবাদ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সশরীরে মি'রাজ ভ্রমণ সম্পর্কে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর ঘোর সন্দেহ ছিল। এসব সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কোনো মারাত্মক অমিল দেখা যায়নি। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো দিক দিয়ে অমিল থাকলেও অপরাপর শত দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে মিলও ছিল গভীর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর কাছে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন যে, এমন কিছু লোকও আছে যে, যারা ভুল মতবাদ প্রচার করে থাকে এবং আমাদেরকে কাফির বলে সাব্যস্ত করে, তারা নিজেরা কাফির কিনা? হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন যে, 'আল্লাহ দুই জন' একথা না বলা পর্যন্ত কেউ কাফির হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামের পর এ মতবিরোধ খুব জোরেশোরে চলতে থাকে। এ ধরনের বহু দল কালক্রমে উপদলের সৃষ্টি হয়।

আকীদা এবং ফিকহ সংক্রান্ত এমন মাসায়িলও পেশ হতো যার সম্পর্কে কোনো অকাট্য দলীল মিলিত না। এসবের মীমাংসার জন্য ইজতিহাদের বিপুল প্রয়োজন পড়ত। এজন্য হাজার লোকের হাজার মত দেখা দিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের সমস্ত মতামত সহীহ নয়। কিন্তু একথাও বলা চলে না যে, এর সব কিছু কুফর। ধর্মীয় জোশ এবং স্বীয় মতের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্ধ ও দিশাহারা হয়ে লোকেরা তখন একে অপরের মতবিরোধকে বিন্দুপরিমাণও সহ্য করে উঠতে পারত না। অত্যন্ত



অসহিষ্ণুভাবে একে অপররের বিরোধিতা করত। কথায় কথায় কুফরের ফাতওয়া দেওয়া হতো।

ধর্ম সম্পর্কে যিনি যতো বেশি গোঁড়া ছিলেন কুফর-ফাতওয়া প্রদানে তিনি ততো বেশি অসাবধান থাকতেন। এভাবে একে অপরের পথভ্রান্তি ও গোমরাহি প্রমাণ করার জন্য হাদীসের দুর্বল রিওয়ায়াতের সাহায্য নিতে লাগলেন। কাজেই এতো সংখ্যক দল-উপদল গড়ে উঠল যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের সেই ৭২ দলের মধ্যে মাত্র একদল সুপথগামী ছিল। আর অবশিষ্ট সকল দল পথভ্রষ্ট ছিল।

সেসব বিভিন্ন দলের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছিল। এতেও পরিতুষ্ট হতে না পেরে প্রত্যেক দল নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রিওয়ায়াতের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন। এভাবে বিরাট মুসলিম জাহান খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ল। আর বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন মাযহাব, চরিত্র, সভ্যতা ও জীবিকা নির্বাহের উপায়সমূহ অবলম্বিত হলো। ইসলাম জগতে সে রকম দুর্দিনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সুর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছিল। তিনি তখন জোরেশোরে প্রচার করে বেড়াতেন যে, একই কেবলার কাউকেও কাফির বিবেচনা করা অনুচিত। প্রথমত অতিঅল্প লোকেই তাঁর সেই ঘোষণাবাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে লোকেরা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করল। এভাবে তাঁর ঘোষণাবাণী একদিন ফলপ্রসূ হয়ে উঠল।

## কেবলাঅলাগণ সব মুমিন

বহুচিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, তাহকীক ও পরীক্ষার পর তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আর বিভিন্ন মাযহাবের মূল আন্দোলনকারীরা তাঁর জমানাতেই জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও তাদের সাথে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। খারিজিদের নেতা বাসরার অধিবাসী ছিল। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শহর হতে খুব বেশি দূরে ছিল না। বাসরায় আরও বহু মাযহাবের প্রতিষ্টাতা জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাদের অনেকের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আর তাঁদের জল্পনা-কল্পনা ও ভাবধারার সাথে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সেই বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কথা প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক আগাগোড়াই সত্যের সাথে সংশ্রবহীন ছিল। অনেকগুলো বিকৃত ভাব-ধারার সন্তুষ্টি ছিল। আর কতকগুলো প্রকৃতপক্ষেই বৃথা ও বাজে ছিল। কিন্তু তা কুফরের সীমা

পর্যন্ত পৌঁছেনি। কাজেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ সাধারণ আদেশ প্রচার করলেন যে, আহলে কেবলা অলারা মুমিন।

তিনি দেখতে পেলেন যে, যেসব মাসআলার ওপর ভিত্তি করে কিয়াস গড়ে উঠছিল এবং যা কুফর ও ইসলামের মধ্যে ভেদরেখা টেনেছিল, তাতে অসংখ্য শব্দ বিভ্রাটে ও প্রকাশ-ধারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কুরআন কদীম হওয়া না হওয়া এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ছিল। একে প্রায় তাওহীদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল।

বহু নামজাদা আলেমের অভিমত হচ্ছে, দু'জন মহাত্মা ইসলামকে বড় সঙ্কট মুহূর্তে রক্ষা করছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আরবের ওপর ধর্মভ্রষ্টেরা যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠল তখন হযরত আবু বকর (রাযি.) তাদেরকে দমন করে ইসলামের গৌরব রক্ষা করলেন। মামুনুর রশীদের জমানায় লোকেরা কুরআনের মৌলিকতা সম্পর্কে যখন সংশয়-বাতিকগ্রস্থ হয়ে পড়ল তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইসলামকে বিপদাপন্ন অবস্থা হতে উদ্ধার করেন। এ দিক দিয়ে তাঁরা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর ওপর অধিক গুরুত্ব দান করছেন যে, হযরত আবু বকরের (রাযি.) সেই কাজে মুহাজির ও আনসারবৃন্দ তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কাউকেও সাহায্যকারী হিসেবে পাননি।

## হাদীস ও উসুলে হাদীস

'ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ততো পরিপক্ক লোক ছিলেন না' এমন ধারণা যদিও ভুল ছিল এবং তা অবশ্যই সুস্পষ্ট ভ্রান্ত-ধারণা। তবুও তা অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই যে, বুযুর্গানে দীনের মধ্যে এমন শত-সহস্র লোক অতীত হয়েছেন, যাঁরা ইজতিহাদ ও রিওয়ায়াত উভয় ব্যাপারেই চরম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসের কোনো কিতাব লিখে যাননি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) ও ইমাম শাফিয়ী (রহ.)ও জগতে মুহাদ্দিস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। সিহাহ সিত্তা যেভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছিল তাঁদের কারও গ্রন্থ তদ্রূপ স্বীকৃতি লাভ করেননি। ইলমে হাদীসের দিক দিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁদের তুলনায় অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এত অধিক পরিমাণে সহীহ



হাদীস সংগ্রহে তাঁর সমকক্ষ আর কেউই ছিলেন না। তিনি হাদীস ও রিওয়ায়াতে যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সংগ্রহ ও ইজতিহাদে ততো প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেননি।

ইমাম ইবনে জরীর আত-তাবারী মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ছিলেন। তবুও তিনি মুজতাহিদ হিসেবে পরিগণিত হননি। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) লিখেছেন, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর পর কোনো মৌলিক মুজতাহিদ জন্মগ্রহণ করেননি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমের দৃঢ়বিশ্বাস যে, ইজতিহাদ সম্পর্কে তিনিও পরিপক্ক লোক ছিলেন। তবুও তিনি মুজতাহিদ হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

## মুজতাহিদও মুহাদ্দিসে পার্থক্য

বাস্তব সত্য হচ্ছে, মুজতাহিদও মুহাদ্দিস উভয়েই ওয়ায, কাহিনি ও ফাযায়িল ইত্যাদি বর্ণনার ব্যাপারে প্রায় একই রকম কর্তব্যই পালন করে থাকেন। তবে বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে, মুজতাহিদগণ শুধু সেসব হাদীসের প্রতিই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন যা থেকে শরীয়তের হুকুম পাওয়া সম্ভবপর। এজন্যই প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, মুহাদ্দিসদের তুলনায় মুজতাহিদগণ কম রিওয়ায়াত বর্ণনা করে থাকেন।

আল-মুওয়াত্তা কিতাবে ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর সমূদয় রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাতে মাত্র এক হাজার হাদীস স্থান লাভ করেছে। এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীদের বহু বাণী স্থান লাভ করেছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর সম্মুখে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) স্বীকার করতেন, হাদীস সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত।

ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.)-এর শায়খ কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম (রহ.) প্রায়ই আক্ষেপের সাথে বলতেন যে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.) যদি হাদীসের প্রতি পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দিতেন তবে তিনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে অভাব শূন্য করে দিতে পারতেন।

## খুলাফায়ে রাশিদীনের অল্প হাদীস-বর্ণনা

ইমাম আবু হানিফা (রাযি.)-এর ওয়াকিফহাল অবস্থা ও সূক্ষদর্শিতা অস্বীকার করা অদূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক। যদিও ইমাম

আবু হানিফা (রহ.) অতিকম কিতাব লিখছেন এবং রিওয়ায়াতও কম করছেন, এতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি অদূরদর্শী ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সঙ্গ লাভের সুযোগ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর চেয়ে অপর কারও অধিক ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য এবং কার্যকলাপের সাথে যেরূপ সুপরিচিত ছিলেন তদ্রূপ সৌভাগ্য আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি। কিন্তু সকল হাদীসের কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সত্তরের চেয়ে অধিক নয়। তাতে কি কেউ বলতে চান যে, তিনি মাত্র সেই কয়েকটি হাদীসেই অবগত ছিলেন?

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পরই হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর স্থান। তিনিও মাত্র পঞ্চাশটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হযরত উসমান (রাযি.)-এর অবস্থাও তদ্রূপ। অথচ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করছেন ৫৩৪৬টি হাদীস। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণনা করছেন ২২৮৬টি হাদীস। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করছেন ২২৪০টি হাদীস। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) হতে ২৫৪০টি হাদীস এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) যিনি নবীর জমানায় যুবক ছিলেন তিনি বর্ণনা করছেন ২৬৩টি হাদীস।

## ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সাথে ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলমানের সম্পর্ক

এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, সিহাহ সিত্তার সংকলনকারীগণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছ হতে কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। অপরাপর ইমাম সম্পর্কে সেই একই কথা প্রযোজ্য। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.) ও ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.) প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসীন হাদীস রিওয়ায়াত সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-কে তসলিম করছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সনদ দিয়ে কোনো রিওয়ায়াত করেননি। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উক্ত কাজের নিন্দা করছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তির অবতারণা করেননি। *সুনানুত তিরমিযী*, *সুনানে আবু দাউদ* ও *সুনানে ইবনে মাজাহে*ও ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বর্ণিত অতিকম হাদীসই পরিলক্ষিত হয়।



## মুহাদ্দিসদের মধ্যে দুইটি দল

হাদীস শিক্ষা ও শিক্ষা প্রদানে যেসব লোক নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুইটি দল রয়েছে। হাদীস ও রিওয়ায়াত সংকলনে যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা শুধু রিওয়ায়াত কিভাবে পাওয়া গেল তাই লক্ষ করতেন। এর মধ্যে কোনটি নাসিখ কোনটি মানসুখ সেই খেয়ালও তাঁরা করতেন না। অপর দলটি হাদীস হতে কি কি আদেশ ও মাসআলা বের করা যায় তার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কোনো অকাট্য দলীল পাওয়া না গেলে কিয়াস দ্বারা এর মীমাংসা করা হতো।

প্রথম দলটি আহলে রিওয়ায়াত বা আহলে হাদীস এবং দ্বিতীয় দলটি মুজতাহিদ বা আহলুর রায় নামে পরিচিত ছিলেন। ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.), ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) ও ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) আহলুর রায় নামে পরিচিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁরা মুহাদ্দিস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুজতাহিদ ও মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু যেহেতু হাদীস পরীক্ষা ও ইজতিহাদের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত সেজন্য তাঁদের একদল আহলুর রায় এবং অপর দলকে আহলুল হাদীস বলা হতো। এজন্য ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর সাথে তুলনায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মুজতাহিদ ও আহলে রায় উপাধিতে অধিক পরিচিত হতেন।

একদিন নযর ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে আপনাদের কি অভিযোগ রয়েছে। তিনি বললেন, রায় সম্পর্কে তাঁর সাথে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে। নযর বললেন, ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) কি রায় অনুযায়ী আমল করেন না? ইমাম আহমদ হাম্বল (রহ.) বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রায়ের ওপর অধিক উভয়কেই সমান অভিযোগকারী হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। বরং তিনি চুপ করে রইলেন।

## আহলে রায় উপাধি

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পূর্বে ফিকহ কোনো নির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। এমন হাজার হাজার মাসআলা উপস্থাপিত হতো যে, সে সম্পর্কে কোনো হাদীস দূরের কথা বরং সাহাবায়ে কেরামের কোনো

বাণী পর্যন্ত ছিল না। কাজেই কিয়াস দ্বারা এসবের মীমাংসা করতে হতো। পূর্বেও কিয়াস দ্বারা এসব মীমাংসা করা হতো। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামও কিয়াস করতেন। আর সেই অনুযায়ীই ফাতওয়া দিতেন। এর বিস্তৃত বিবরণ সম্মুখে পাওয়া যাবে।

সেই সময় পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতা ততো বিস্তৃতি লাভ করেনি। এজন্য কিয়াসের অপরিহার্য প্রয়োজন হয় এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটতো না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহকে একটি বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত করতে চেয়েছিলেন। কিয়াসের সাহয্যে যতো বেশি নেওয়া হতে লাগল সেই পরিমাণ উসুল ও আইন-কানুনের প্রয়োজনও ততো প্রকট হয়ে ওঠল। এসব কারণেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রায় ও কিয়াসের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধি লাভ করার অপর একটি কারণ এই ছিল যে, সাধারণ মুহাদ্দিসীন, হাদীস ও রিওয়ায়াতের ব্যাপারে (অনুভূতি)-এর প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করতেন না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রথমে এর ভিত্তি স্থাপন করেন। এর সাহায্যে বহু উসুল ও কাওয়ায়িদের কিতাব লেখা হলো এবং উসুলের মাপকাঠি অনুযায়ী না হওয়ায় তিনি বহু হাদীস বাদ দেন।

এসব আনুষঙ্গিক তর্ক-বিতর্কের পরে এখন আমরা আসল মাসআলায় প্রতি ফিরে আসছি। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইলমে ফিকহশাস্ত্রে কতখানি ব্যুৎপত্তি হাসিল করছেন এ সম্পর্কে উপসংহারে পৌঁছতে হলে তাঁর ইলমী জীবনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ সম্পর্কে বহু সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব রয়েছে। যেসব কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীস সংকলন সম্পর্কে বহু বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বিশ বছর বয়স হতে ইলমে হাদীসের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এতেই নিমগ্ন ছিলেন। তিনি কুফার বিখ্যাত হাদীস-বিশারদ হতে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি মক্কা-মদীনার হাদীসের মজলিসেও যোগদান করতেন। মদীনার শায়খগণ তাঁকে সনদ দান করেন।

ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.), হযরত নাফি' মাওলা ইবনে ওমর (রহ.), মুহারিব ইবনে দিসার (রহ.), ইমাম সুলাইমান আল-আ'মাশ আল-কাহিলী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.), আলকমা ইবনে মারসাদ আল-হাযরামী (রহ.), হযরত মাকহূল ইবনে রাশিদ আশ-শামী



(রহ.), ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.), ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীয়ী (রহ.), ইমাম সুলাইমান ইবনে ইয়াসার আল-মাদানী (রহ.), ইমাম আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আ'রাজ (রহ.), ইমাম মনসুর ইবনুল মুতামির (রহ.) ও ইমাম হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ.) প্রমুখ হাদীস বিশারদবৃন্দ তাঁর উস্তাদ ছিলেন।

তাঁরা প্রত্যেকেই হাদীসশাস্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁদের রিওয়ায়াত হতেই *সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* শরীফ সংকলিত হয়েছে। হাদীস-শাস্ত্রে তাঁরা অত্যন্ত পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন। শুধু তাঁর উস্তাদগণ নন, তাঁর শাগরেদগণও কম জবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন না। নিম্নে তাঁদের প্রসিদ্ধ ইমামের নাম দেওয়া হলো:

১. জরাহ ও তা'দীলশাস্ত্রের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.)।
২. ইমাম আবদুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম আল-হিময়ারী (রহ.)। *আল-জামিউল কবীর* তাঁর একটি বিখ্যাত কিতাব। ইমাম বুখারী (রহ.) উক্ত কিতাব হতে বহু ফায়দা লাভ করেন।
৩. ইমাম ইয়াযীদ ইবনে হারুন আস-সুলামী (রহ.)। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর উস্তাদ ছিলেন।
৪. ইমাম ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ আর-রুওয়াসী (রহ.)। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলছেন, রিওয়ায়াতের সনদের হাফিয হিসেবে অপর কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।
৫. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)। হাদীসশাস্ত্রে তিনি আমিরুল মুমিনীন হিসেবে খ্যাত ছিলেন।
৬. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা আল-ওয়াদিয়ী (রহ.)। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে আখ্যাদান করছিলেন।

এসব বুযুর্গ ব্যক্তি শুধু নামমাত্র ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শাগরেদ ছিলেন না, বরং তাঁরা বহু বছর পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে থেকে ইলম ও ফয়েয লাভ করেন। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলতেন, আল্লাহ যদি আমাকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) কর্তৃক সাহায্য প্রদানের সুবন্দোবস্ত না করতেন তবে আমি একজন

অতিসাধারণ লোকই থেকে যেতাম। ইমাম ওকী' ইবনুল জার্‌রাহ (রহ.) ও ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়েদা (রহ.) এত দীর্ঘকাল ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর খেদমতে ছিলেন যে, লোকেরা তাঁদেরকে ইমাম পরিবারের লোক বলেই জানত। তাঁরা মামুলি লোক ছিলেন না।

## ইজতিহাদের শর্ত মুজতাহিদরূপে ইমাম আবু হানিফা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মৃত্যুর পর আজ শত বছর অতীতের গর্ভে বিলীন হলেও আজ পর্যন্ত কেউ মুজতাহিদ হিসেবে তাঁর সম্পর্কে অবজ্ঞাভরে একটি কথাও বলেনি। মুসলিমবিশ্বের ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ ইজতিহাদ সম্পর্কে বলছেন, কুরআন-হাদীস, সালফে সালিহীনের বুদ্ধিমত্তা, লুগাত ও কিয়াস সম্পর্কে অর্থাৎ শরীয়তের মাসআলা সম্পর্কে কুরআনে যা কিছু আয়াত রয়েছে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে যা কিছু বিধি বিধান রয়েছে, প্রায় সবগুলো যার জানা থাকে এবং কারও মধ্যে এসবের কোনো কিছুতেই যদি কিছু অপূর্ণতা থেকে থাকে, তবে তাকে মুজতাহিদ বলা যাবে না, তার পক্ষে অপরের তকলীদ (অনুসরণ) করা চাই।

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে খলদুন (রহ.) হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে মুজতাহিদীনের প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন, কোনো কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে থাকে যে, হাদীস-শাস্ত্রে মুজতাহিদীন ততো সুপরিপক্ক নন। এজন্যই তাঁরা কম রিওয়ায়াতে করেন। এসব ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মহান ইমামদের সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা পোষণ করা চলে না। হাদীস-শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অতিউচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে, মুহাদ্দিস সম্প্রদায় তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)

অধিকাংশ মুহাদ্দিসই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) মুহাদ্দিসীনের মধ্যে মহামান্য ব্যক্তি ছিলেন। হাদীস সংকলন সম্পর্কে তিনি একটি নির্দিষ্ট কিতাব লিখে যান। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে তাতে ভূয়সী প্রশংসা করেন। কাযী ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহ.) তাঁকে 'হাদীস-বন্ধু' বলে আখ্যা দান করেছেন।



তিনি বলেন, আমরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে মাসায়িল সম্পর্কে তর্ক করতাম। তিনি যখন কোনো বিষয়ে মতামত দেন তখন আমি সেই মজলিস হতে বের হয়ে কুফা-নগরের মুহাদ্দিসদের কাছে যেতাম। আমি তাঁদের কাছেও বহু হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম। তারপর আমি আবার ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর খেদমতে ফিরে আসতাম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এসব কিছু হাদীস সম্পর্কে তাঁদের সাথে একমত হতেন। আর অপরগুলো ভুল বলে মতপ্রকাশ করতেন। আমি বলতাম, আপনি কিভাবে এসব বুঝতে পারলেন? তিনি বলতেন, কুফায় যে ইলম রয়েছে তা আদৌ আমার জানার বাইরে নয়। এসব হতে বোঝা যায়, ইলমে হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কি রকম সুগভীর জ্ঞান ছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পর ইলমে হাদীসশাস্ত্রের বহু উন্নতি হয়েছে। সত্য-মিথ্যা হাদীস বাছাই করা হয়েছে। সিহাহ সিত্তা সংকলিত হয়েছে। উসুলে হাদীস নামে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে রূপ লাভ করে। এ সম্পর্কে অসংখ্য কিতাব মুদ্রিত হয়েছে। এ বিষয়ে এমন উন্নতি হয়েছিল যে, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সাময়িক প্রয়োজন কোনোকিছুর দিক দিয়েই কোনো প্রকার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হাদীস যাচাই, রিওয়ায়াতের ধারা ইত্যাদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানায় উন্নতির যে চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল আজ পর্যন্তও তা ডিঙিয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

এর সুষ্ঠুতা এখনই আমাদের দৃষ্টিতে নিপতিত হবে যদি আমরা হাদীসশাস্ত্র কায়েম হওয়ার পূর্বাবস্থা পর্যালোচনা করে দেখি। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে, রিওয়ায়াতের ধারা কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল। আর কোনো পর্যায়ে এর কি কি পরিবর্তন হয়েছিল। এতে একথা অনুমান করা সহজ হবে যে, হাদীস যাচাই প্রচেষ্টা তখন কি রকম সুকঠিন কাজ ছিল।

## হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

সনদ ও রিওয়ায়াতের ধারা যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জমানাতেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু তখন তা অতিসাদাসিদা স্বাভাবিক ধরনের ছিল। নুবুওয়াতের তের বছর পর্যন্ত তো ঘোর বিপদের দিন ছিল। তখন প্রাণে বেঁচে থাকাও কঠিন ব্যাপার ছিল। তখন সনদ ও রিওয়ায়াতের সময় কোথায়? তখন হুকুম-আহকাম ও কতর্ব্যাবলিও কম ছিল। প্রথম অবস্থায় নামায ব্যতীত অন্য কোনো ফরয ছিল না। নামাযও তখন সংক্ষিপ্ত ছিল। যুহর, আসর ও ইশা

এই তিন ওয়াক্ত নামায পড়তে হতো। আর প্রতি ওয়াক্তে মাত্র দুই রাকআত ফরয পড়তে হতো।

নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে রোযা ফরয হয়। যাকাত কখন ফরয হয়েছিল এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। হাফিয ইবনে কসীর (রহ.) লিখছেন যে, নবম হিজরীতে রোযা ফরয হয়েছে। হজও একই বছর ফরয হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ে হাদীস ও রিওয়ায়াত জারি হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আসহাবের চেয়ে উত্তম কোনো জাতি দেখিনি। আমি সমগ্র নুবুওয়াতের জমানায় মাত্র তেরটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। যেসব হুকুম ও ঘটনা ঘটতো, তাতেও রিওয়ায়াতের নিয়ম কম জারি ছিল। সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। মধ্যস্থতা ও রিওয়ায়াতের কদাচিৎ প্রয়োজন পড়ত। হাদীস লিপিবদ্ধ করার তখন অনুমতি ছিল না।

হযরত আবু বকর (রাযি.) খলীফার আসনে সমাসীন হন, তখন তাঁকে ধর্মভ্রষ্ট আরববাসীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এটা শেষ হওয়ার পর রোম ও ইরানের সাথে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত খিলাফতের সময় হাদীসের বহুল প্রচার সম্ভবপর হয়নি। হযরত ওমর (রাযি.) সাত-দশ বছর খলীফার আসনে সমাসীন ছিলেন। তখন রাজ্যে পূর্ণ সুখ-শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু তিনি হাদীসের বহুলপ্রচারকে উৎসাহিত করতেন না।

## হযরত ওমর (রাযি.) ও হাদীস-প্রচার

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাবাকাতুল হুফ্ফায* কিতাবে লিখছেন, রিওয়ায়াতকারী যেন আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে কোনো ভুল রিওয়ায়াতে না করেন এ ভয়ে হযরত ফারুকে আযম ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) হাদীস রিওয়ায়াতে উৎসাহ প্রদান করতেন না। সাহাবায়ে কেরামকে তিনি সবসময় হাদীস কম রিওয়ায়াত করতে বলতেন।

একদিন তিনি কিছু আনসারকে কুফায় প্রেরণ করেন। তাঁদের যাত্রাকালে তিনি বললেন, আপনারা এখন কুফায় রওয়ানা হচ্ছেন। আপনারা সেখানে এমন এক কওমের সাথে মিলিত হবেন যাঁরা সেখানে আপনাদের উপস্থিতিতে আনন্দিত হবেন। কিন্তু তাঁরা যখন আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়ে হাদীস শুনতে চাইবেন তখন অধিক হাদীস বর্ণনা করবেন না।



এভাবে সাহাবায়ে কেরাম যখন ইরাকে যেতে লাগলেন তখন তিনি কিছুদূর তাঁদের সাথে অগ্রসর হয়ে তাঁদেরকে বললেন, আপনারা কি জানেন, আমি কেন আপনাদের সাথে অগ্রসর হচ্ছি? তাঁরা জবাবে বললেন, হ্যাঁ। তবে আমার অন্য উদ্দেশ্যও রয়েছে। তা হচ্ছে, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানকার লোক উৎসাহিত করবেন না এবং সেখানকার লোক অধিক কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন। তাঁদেরকে হাদীসের দিকে উৎসাহিত করবেন না এবং আপনারা রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে কম রিওয়ায়াত করবেন।

সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌঁছলে তাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্য লোকের ভিড় করল এবং তাঁরা হাদীস শোনার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এ সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর নিষেধ-বাণী তখন তাঁরা শুনিয়ে দিলেন। হযরত আবু মুসলিম (রহ.) হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর জমানায়ও এভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করতেন? তিনি বললেন, না। তাতে হযরত ওমর (রাযি.)-এর দোররার ভয় ছিল।

হযরত উসমান (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফত বিশ-একুশ বছর পর্যন্ত ছিল। তখন হাদীসের ব্যাপক প্রচার হয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম বহু দূর-দরাজ পৌঁছে যান। প্রয়োজনও তখন উত্তরোত্তর বেড়ে চলছিল। নতুন নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এসব কারণে হাদীস ও রিওয়ায়াত বহু বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত উসমান (রাযি.)-এর রাজত্বকালে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার পরিণামে তিনি শহীদ হন। ইসলামের ইতিহাসে তখন হতে সর্বপ্রথম দলাদলি আরম্ভ হয়।

হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফতের প্রথম দিক হতেই ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে যায়। সেই মতবিরোধিতা ও অশান্তি-উপদ্রবের পাশাপাশি হাদীস-বিভ্রাটও আরম্ভ হয়। যদিও পরবর্তীকালে অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ অধিক বিস্তৃতি লাভ করে, তবুও অধিক ক্ষোভের বিষয় হচ্ছে, স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের জমানাতেই বিদআতী লোকেরা হাদীসের নামে অসংখ্য অহাদীস আমদানি করে। *সহীহ মুসলিমের* মুকাদ্দমায় বলা হয়েছে যে,

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، وَيَقُوْلُ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيْثِهِ،

وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَالِيْ لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيْثِيْ، أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلَا تَسْمَعُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ، وَالذَّلُوْلَ، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ».

'একদিন বুশাইর আল-আদাওয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর প্রতি কর্ণপাত করলেন না। তখন বশীর বললেন, হে ইবনে আব্বাস! আমি আল্লাহর রাসূল হতে বর্ণনা করছি, আর আপনি তৎপ্রতি মনোযোগ দিতেছেন না, এ কেমন কথা? তিনি বললেন, 'এমন এক জমানায় আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, কাউকেও বলতে শুনলে তখনই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম এবং মনোযোগ দিয়ে তা শুনতাম। কিন্তু যে সময় লোক-সমাজে নেকি-বদির পার্থক্য ওঠে গেছে তখন হতে আমি শুধু সেসব হাদীস শুনে থাকি যা আমি নিজেই জানি।"[১]

মৌখিক রিওয়ায়াতের ন্যায় লিখিত রিওয়ায়াতেও রদ-বদল শুরু হয়ে গেল। ইমাম মুসলিম (রহ.) রিওয়ায়াত করছেন যে, একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হযরত আলী (রাযি.)-এর এক মীমাংসায় নকল নিচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে শব্দ পরিত্যাগ করে যাচ্ছিলেন, আল্লার কসম! হযরত আলী (রাযি.) কখনও এই মীমাংসা করেননি।[২] এভাবে অন্য একসময়ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হযরত আলী (রাযি.)-এর এক লিখিত রিওয়ায়াতে দেখে অল্প কিছু শব্দ ব্যতীত অন্যান্য সবকিছু মিটায়ে দিলেন।

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৩

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৩:

عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِيْ كِتَابًا، وَيُخْفِيْ عَنِّيْ، فَقَالَ: «وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُوْرَ اخْتِيَارًا، وَأُخْفِيْ عَنْهُ»، قَالَ: فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ، فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ، فَيَقُوْلُ: «وَاللهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ ضَلَّ».



## হাদীস সংকলনে অসাবধানতার কারণ

সনদ ও রিওয়ায়াতের কোনো পন্থা না থাকায় নির্দিষ্ট হাদীসের নামে বহু অহাদীস প্রচার করা হয়েছিল। যেকোনো লোক ইচ্ছা করলে বলে দিত, এতে কাউকেও সনদের ধার ধারতে হতো না। ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) *কিতাবুল ইলালে* ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, পূর্ব জমানায় লোকেরা সনদ সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না। এরপর এতে যখন অনাচার ঢুকল, তখন আহলে সুন্নতের হাদীস গ্রহণ এবং আহলে বিদআতদের অহাদীস বর্জনের জন্য সনদের প্রয়োজন হয়ে উঠল। কিন্তু হাদীস সম্পর্কে অসাবধানতা শুধু বিদআতীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন তখন সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। অহাদীস প্রচার তখন অব্যাহত রয়ে গেল।

বনি উমাইয়াদের শাসনকাল আরম্ভ হয়ে গেল। আর খুব জোরেসোরে হাদীস প্রচারও শুরু হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম সংখ্যায় দিনদিন যতোই কমতে লাগলেন তাঁদের গুরুত্বও ততো বেশি বেড়ে চললো, সভ্যতার দিক দিয়েও অনেক বেশ অগ্রসর হয়ে চললো। নতুন সম্প্রদায়ের লোক মুসলমান হতে আরম্ভ করল। এদিক দিয়ে তো নও-মুসলমানদের নব-প্রেরণা ছিল। অপরদিক দিয়ে বিজয়ী দল বিজিতদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করার জন্যে ওঠে পড়ে লেগে গেল। এসব পরিস্থিতির কল্যাণে ধর্ম সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করার প্রেরণা লোকের মধ্যে এমনভাবে পেয়ে বসল যে, তারা এ সম্পর্কে আরববাসীদের চেয়ে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠল।

মোটকথা ইসলামি রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে হাদীসও রিওয়ায়াতের চর্চা আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে শত শত মাদরাসা স্থাপিত হলো। কিন্তু হাদীস প্রচার যতোই দ্রুতগতিতে আরম্ভ হোক না কেন রিওয়ায়াতের বিশ্বস্ততা ও শুদ্ধতা ততোই হ্রাস পেতে লাগল। রিওয়ায়াতকারীর সংখ্যা এতো বেশি বেড়ে ওঠল যে, ভিন্নভিন্ন চিন্তাধারা, কার্যধারা ও বিভিন্ন আকায়িদও এতে প্রবেশ-পথ পেল। শত গোত্রের লোক একত্রে সমবেত হলো। বিদআতীরাও সংখ্যায় বেড়ে চললো। আর প্রত্যেকেই নিজেদের মতবাদের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানে ওঠে পড়ে লেগে গেল।

অতিদুঃখের বিষয় হচ্ছে, এভাবে সুদীর্ঘ একযুগে অতীত না হওয়া পর্যন্ত এর কোনো প্রতিকার হলো না। এর মারাত্মক পরিণাম এ দাঁড়াল যে, এতো অসাধারণভাবে রিওয়ায়াত চলতে লাগল যে, হাদীসের নামে অহাদীস ও ভুল

হাদীসের এক দফতর স্তুপীকৃত হয়ে গেল। এসব অনাচার বিদূরিত করার মানসে ইমাম ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.) স্বীয় জমানায় সহীহ হাদীস পৃথক করতে গিয়ে কয়েক লক্ষ হাদীস বাছাই করে *আল-জামিউস সহীহ* লিপিবদ্ধ করেন। এতে তাকরারসহ ৭৩৯৭টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

## হাদীসের সাথে অহাদীস কিভাবে মিশল?

হাজার হাজার এমন কি লক্ষ লক্ষ অহাদীস জানা-বোঝা লোকের অসাবধানতার কারণে হাদীস হিসেবে প্রচলিত হয়। কেউ কেউ হাজার হাজার, এমনকি এক ব্যক্তি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি চার হাজার এবং অপর এক ব্যক্তির অসাবধানতার মধ্যে চৌদ্দ হাজার অহাদীস হাদীস হিসেবে প্রচলিত হয়। প্রত্যেকে যে শত্রুতা করে এমনটা করছে তা নয়। অনেকে নেক নিয়তে ততো সাবধানতা অবলম্বন করেননি। এতে ধর্মের দিক দিয়ে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়।

ভুল বোঝাবুঝি ও অসাবধানতার দরুণ হাজার হাজার অহাদীস হাদীস নামে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা বলে প্রচার করা হয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিসের রীতি এই ছিল যে, হাদীসের সঙ্গে তাঁরা তফসীরও বয়ান করতেন। আর তফসীরের বহু কথাই তাঁরা উহ্য রেখে যেতেন। তাতে শ্রোতাবর্গ ধোঁকায় নিপতিত হতো। আর তাতে কোনটি হাদীসের কথা এবং কোনটি তাফসীরের কথ তা বুঝে ওঠা শ্রোতাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত। আর তাও যে শুধু সাধারণ লোকের দ্বারা সংঘটিত হতো, তা নয়। বরং কুরআন ও হাদীস-বিশারদ বহু লোকের দ্বারাও তা সংঘটিত হতো।

ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) এবং ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর মতো লোকের মধ্যেও এসব ত্রুটি পরিলক্ষিত হতো। ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) সম্পর্কে হাফিয শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়ী (রহ.) লিখেছেন, 'এভাবে ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) অধিকাংশ হাদীসের তফসীর করতেন এবং সেসব হরফে সেই মর্মের তফসীর হওয়া ছিল, তা তিনি ছেড়ে দিতেন। তিনি প্রায়ই হাদীসের মধ্যে 'অর্থাৎ' বলে উদ্দেশ্য বয়ান করতেন এবং কোনো কোনো সময় তিনি 'অর্থাৎ' শব্দও ছেড়ে দিতেন। এতে



শ্রোতাবৃন্দ সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান হয়ে পড়ত। 'রিজাল' ও 'উসুলে হাদীস' কিতাবে এ জাতীয় বহু দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।'[১]

## হাদীসে রদবদল ও রূপ পরিবর্তন

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানায় হাদীস শরীফের যে সংকলন সংকলিত হয়েছিল তাতে হাজার হাজার মওযু' (বানোয়াট) হাদীস, ভ্রম-ত্রুটি ও দুর্বলতা ইত্যাদিও কম ছিল না। হাদীসকে যাঁচাই-বাছাই করার জন্য তখন ইমাম ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) কেউই ছিলেন না। একথা সত্য যে, ফিকহশাস্ত্রের প্রতি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আপ্রাণ আগ্রহ থাকায় তিনি হাদীস সংকলনে পরিপূর্ণ মনযোগ দিতে পারেননি। তবুও তিনি সুপরিচালিত করবার ভিত্তি পত্তন করে যান। এর জন্য তিনি যাবতীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধান রেখে গেছেন। তাঁর হাদীস-যাচাই মাপকাঠি অত্যন্ত কঠিন ছিল।

এজন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁকে কঠিন রিওয়ায়াতকারী বলে উপাধি দান করেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসদের তুলনায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে সর্বাপেক্ষা কম রিওয়ায়াত করছেন এর কারণ তাই ছিল। ইমাম ইবনে খালদুন (রহ.) লিখেছেন, 'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রিওয়ায়াত বহু কম করছেন। এর কারণ হচ্ছে, তাঁর রিওয়ায়াতের শর্তাবলি অত্যন্ত শক্ত ছিল।'[২] হাদীস সম্পর্কে তাঁর মোটামোটি ধারণা জন্মেছিল যে, এমন হাদীস অতিকম যা সহীহ। যা এমন হাদীস অতিবিরল' যার পিছনে যথেষ্ট দলীল রয়েছে বা সেই যুগও ছিল বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার যুগ।

## সহীহ হাদীস অতিকম

এক হাদীস বর্ণনাকারীর সাথে অন্য হাদীস বর্ণনাকারীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন অন্য ধরনের লোক। তিনি তাঁর জমানার বহু শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের কাছ হতে হাদীস সম্পর্কে যা কিছু উপকরণ ও তথ্য পাওয়া যেত তিনি তা সংগ্রহ করেন। তিনি মক্কা-মদীনার শিক্ষা-মজলিসে সুদীর্ঘকাল শিক্ষার্থী হিসেবে কাটিয়ে দিয়েছেন। কুফা, বাসরা, মক্কা ও মদীনায় যেসব নামজাদা

---

[১] আস-সাখাওয়ী, ***ফাতহুল মুগীস বিশরহি আলফিয়াতিল হাদীস***, খ. ১, পৃ. ৩০৩

[২] ইবনে খালদুন, ***তারীখু ইবনি খালদুন***, খ. ১, পৃ. ৫৬১

রিওয়ায়াতকারী ছিলেন তাঁদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা হতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মৌলিক শক্তিমত্তা, স্বভাব-চরিত্র এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়াবলির সাথে সুপরিচিত হতেন।

মোটকথা হচ্ছে, যেকোনো মাসআলা সম্পর্কে হ্যাঁ বা না করার জন্য মুজতাহিদ হিসেবে যা কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মধ্যে সেসবের সমন্বয় ছিল।

## তিনি কার ভক্ত ছিলেন?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) অত্যন্ত জবরদস্ত সাহাবা ছিলেন। হানাফী মাযহাব তাঁর রিওয়ায়াতের ওপর বিশেষভাবে অধিক নির্ভরশীল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) যদিও জবরদস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসীনের তুলনায় তিনি রিওয়ায়াত অতিকম করছেন। তিনি অত্যন্ত শক্ত ও সতর্ক ব্যক্তি ছিলেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) তাঁর প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) রিওয়ায়াত ব্যাপারে পরিপক্ক লোক ছিলেন। তিনি হাদীসের রিওয়ায়াত অত্যন্ত কম করতেন।'

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যদিও অন্যান্য বহু লোকের কাছ হতে শিক্ষালাভ করছিলেন, তবুও তিনি যা কিছু শিক্ষা ও ভাব-ধারাপ্রাপ্ত হন সেগুলোর সবকিছুর কেন্দ্র ছিল সেই খান্দানী প্রেরণা, যিনি তাঁর হৃদয়ে এই ভাবধারা জন্মিয়ে দিয়েছিলেন।

## রিওয়ায়াতে ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) রিওয়ায়াতের ব্যাপারে যে পদ্ধতি ও শর্তারোপ করছেন তা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শর্তাবলির প্রায় কাছাকাছি। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর নাম শক্ত রিওয়ায়াতকারী হিসেবে নেওয়া হয়ে থাকে। ইমাম ইবনুস সালাহ (রহ.) লিখেছেন, 'শক্ত রিওয়ায়াতকারীদের মাযহাব হচ্ছে, একমাত্র সেই হাদীসই গ্রহণযোগ্য যা রাবী স্মৃতিপটে স্মরণ করে রেখেছেন। ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতও তাই।'

জনৈক মুহাদ্দিস লিখছেন, 'ইমাম মালিক (রহ.) যখন প্রথম *আল-মুওয়াত্তা* লিখেন, তখন এতে দশ হাজর হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়। ইমাম



মালিক (রহ.) যখন এর পর তাহকীক করতে থাকেন তখন হাদীসের সংখ্যা কমতে আরম্ভ করে এবং মাত্র ছয় সাতশত অবশিষ্ট থেকে যায়। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ভাব-ধারা প্রকাশ করছেন।

## সহীহ হাদীস ও ইমাম শাফিয়ী (রহ.)

ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকী (রহ.) রিওয়ায়াত করছেন যে, একদিন এক বুযুর্গ ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-কে বললেন, আপনি কি সেসব হাদীস লিপিবদ্ধ করছেন যা রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে সাবিত হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, মা'রিফাত অভিজ্ঞ বুযুর্গদের অভিমত হচ্ছে, সহীহ হাদীসের সংখ্যা অতিকম। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ হতে যে হাদীস রিওয়ায়াত করছেন তাঁদের সংখ্যা সত্তরের অধিক নয়।

হযরত ফারুকে আযম (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর বহুদিন জীবিত ছিলেন। অথচ তিনি পঞ্চাশের চেয়ে কম হাদীস রিওয়ায়াত করছেন। হযরত উসমান (রাযি.)-এর অবস্থাও অভিন্ন। হযরত আলী (রাযি.) যদিও লোকদেরকে হাদীস শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন, তাঁর বর্ণনা কিন্তু কম। তাঁরা ব্যতীত অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আহলে মা'রিফাতদের কাছে সেসব রিওয়ায়াত সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

## রিওয়ায়াতের নির্দিষ্ট শর্তাবলি

এসব কথা শুনে কেউ যেন এমন ধারণা না করেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মু'তাযিলাদের ন্যায় হাদীসের অস্বীকারকারী ছিলেন। অথবা এমন ধারণাও যেন কেউ না করে যে, তিনি মাত্র দশ-বিশটি হাদীসকে মান্য করতেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দ তাঁর থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসীনের তুলনায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে, তাঁর রিওয়ায়াতের শর্ত বড় কড়া ছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রিওয়ায়াতের যেসব শর্তারোপ করছেন এর মধ্যে এমন কিছু শর্ত আছে যা অপরাপর মুহাদ্দিসদের কাছেও সমাদৃত হয়েছে। আর এমন কিছু শর্তও রয়েছে যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইমাম মালিক (রহ.)সহ অনেক মুজতাহিদ একই মতাবলম্বী ছিলেন। এর মধ্যে একটি

মাসআলা হচ্ছে, 'একমাত্র সেই হাদীসই গ্রহণযোগ্য যা রাবী নিজ কানে শুনেছেন এবং রিওয়ায়াত পর্যন্ত তা তাঁর স্মরণ ছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, এতে কারও কোনো ওজর-আপিত্ত হতে পারে না। সাধারণ মুহাদ্দিসীন তাঁর সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁদের রায় হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রায় অনুযায়ী রিওয়ায়াতকারীর রিওয়ায়াত ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

পাঠকবর্গ বিবেচনা করে দেখুন, প্রথম কি সতর্কতার প্রয়োজন, না রিওয়ায়াতের। নিম্নে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পারিপার্শ্বিকতা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেই বোঝা যাবে যে, তিনি কেন এ সম্পর্কে এত কঠোর পন্থা অবলম্বন করছিলেন। শায়খদের বিরাট শিক্ষা-মজলিস থাকত। কোনো কোনো শিক্ষা-মজলিসে দশ হাজারের চেয়ে অধিক শ্রোতার সমাবেশ থাকত। এতে কতিপয় নকীব নিযুক্ত করতে হতো। তাঁদের মধ্যস্থতায় শায়খ বক্তৃতা দূর-দূর পর্যন্ত পৌঁছত। এমনও হতো যে, শ্রোতাদের কানে শায়খের একটি শব্দও পৌঁছত না। তাঁরা শুধু মধ্যস্থ ব্যক্তির মুখে শুনেই হাদীস রিওয়ায়াত করতেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যিনি শুধু মধ্যস্থ ব্যক্তির মারফত হাদীস শুনছেন তাঁর পক্ষে হাদীস বর্ণনা করা কতখানি সমীচীন। অধিকাংশ রিওয়ায়াতকারী তা সমর্থন করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিরোধিতা করেছেন। হাদীসের ইমামদের মধ্যে হাফিয আবু নুআইম আল-আসবাহানী (রহ.), ফযল ইবনে ওয়াকী' (রহ.) ও যায়েদ ইবনে কিরামা (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে একমত।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানায় অর্থ অনুযায়ী রিওয়ায়াতের বহুলপ্রচার ছিল। আর অতিকম লোকেই হাদীসের শব্দাবলির পাবন্দি করতেন। এজন্য রিওয়ায়াত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সমূহ সম্ভাবনা থাকত। অন্ততপক্ষে একথা সুনিশ্চিত যে, প্রথম যে ব্যক্তি রিওয়ায়াত করতেন তা যতো শক্তিশালী হতো, দ্বিতীয় অবস্থায় তা ততো শক্তিশালী হতো না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিরাট শিক্ষা-মজলিসে কয়েকজন মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত করতে হতো। প্রায় নকীব ব্যতীত কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো না। কিন্তু সমস্যা এই ছিল যে, যে ব্যক্তি নকীবের মুখে হাদীস না শুনে স্বয়ং শায়খের মুখে তা শুনতে পেতেন এবং আর যাঁরা নকীবের মারফত হাদীস শুনতেন উভয়কে একই চোখে দেখা হতো। গাফেল ও কম বুদ্ধি-



সম্পন্ন ব্যক্তিও মাঝে-মাঝে নকীবরূপে নিয়োজিত হতেন। এজন্য ভুল-ত্রুটির অধিক সম্ভাবনা থাকত।

এরচেয়ে অধিক মারাত্মক বিষয় এই ছিল, 'আমরা শুনেছি ও জেনেছি, শব্দগুলো অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন নিতান্ত সাধারণ অর্থে ব্যবহার করতেন। ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.) কয়েকটি রিওয়ায়াতে বলছেন, 'আমি হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর মুখে শুনেছি।' কিন্তু তিনি হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর সাথে কখনও মিলিত হননি। তিনি এর ব্যাখ্যাদানে বলছেন যে, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) যে শহরে থেকে এ হাদীস বয়ান করছিলেন তিনি সেই শহরে ছিলেন।

এভাবে অন্যান্য শায়খগণ ও সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতেন। আর তাঁরা এর তাৎপর্যস্বরূপ বলতেন যে, তাঁদের শহরবাসীগণ সেসব শায়খদের কাছ হতে তা শুনেছিল। অন্য এক মুহাদ্দিস বলছিলেন যে, হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.) যেসব লোকের কাছ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করছেন তিনি সেসব ব্যক্তির সাথে মিলিত হননি। অবশ্য হযরত আলী (রাযি.)-এর নাম নিয়ে হাদিস বর্ণনা করা উমাইয়া শাসনের কারণে সম্ভব হয়নি। অথচ তিনি হযরত আলী (রাযি.)-কে দেখেছেন। এর কৈফিয়ত হিসেবে বলা হতো যে, তাঁর সম্প্রদায়ের লোক সেসব লোকের কাছ হতে উক্ত হাদীস শ্রবণ করছেন। এটাও এক প্রকার ভুল বিবৃতি।

এছাড়া এটা হাদীসের সনদকে কিছুটা সন্দেহযুক্ত করে তুলে। কারণ রাবী যখন স্বয়ং শায়খের মুখে হাদীস শুনেননি, তাই তাতে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মধ্যস্থতা থাকবেই থাকবে। আর যেহেতু রাবী তাঁর নাম উল্লেখ করেননি, এজন্যই তাঁর বিবৃতি দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এ অবস্থায় উত্তম ধারণাই একমাত্র সম্বল। তিনি যাঁর কাছ হতে তা শুনেছেন তা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হবে, এটিই একমাত্র ভরসা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ তরীকাকে না-জায়েয বলছেন। হাদীসের অন্যান্য বহু ইমামও উক্ত মত পোষণ করেছেন।

প্রধান রিওয়ায়াতকারীদের ধারা এমন ছিল যে, তাঁরা যখন কারও কাছ হতে কোনো হাদীস শুনে লিপিবদ্ধ করতেন তখন তাঁদের কাছ হতে সর্বদা রিওয়ায়াত করা জায়েয মনে করতেন। রাবীর যদি হাদীসের শব্দাবলিও স্মরণ না থাকত তখনও তাঁর থেকে বর্ণনা করতে কোনো দ্বিধাবোধ করা হতো না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ তরীকাকে কায়েম রাখলেন, কিন্তু শর্ত হচ্ছে,

হাদীসের শব্দসমূহ ও ভাবধারা অটুট চাই। অন্যথায় রিওয়ায়াত জায়েয হবে না।

যদিও সাধারণভাবে এটি প্রচলিত হয়নি, তবুও মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়ী (রহ.) তা সুপ্রচারিত করছেন এবং ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) ও অন্যান্য বহু ইমাম এর সমর্থন করছেন। ইমাম ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.)-এর জমানায় এর প্রয়োজনও ততো সুপ্রকট ছিল না। কেননা তখন শব্দসহ রিওয়ায়াত করা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সময় পর্যন্ত বেশিরভাগ ভাব অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করা যেত। এজন্য রাবীর যদি হাদীসের শব্দ, হাদীসের ঘটনা, শানে উরূদ ইত্যাদি স্মরণ না থাকত তখন রিওয়ায়াত অটুটভাবে বর্ণনা করা অসম্ভবের প্রায় কাছাকাছি হয়ে পড়ত। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বর্ণনা করা অসম্ভবের প্রায় কাছাকাছি হয়ে পড়ত। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একটা সীমারেখা টেনে দেন। আর প্রকৃত কথা হচ্ছে, এ রকম করার প্রয়োজনও ছিল তখন অত্যন্ত সুগভীর।

## ভাব-ধারার ভিত্তিতে রিওয়ায়াত

ভাব-ধারার ভিত্তিতে রিওয়ায়াত বৈধ কিনা তা তখনকার দিনে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা ছিল। এ সম্পর্কে সর্বদা মতবিরোধ চলে আসছে। আজও এর জের থামেনি। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, কোনো কোনো তাবিয়ী একটি হাদীস একাধিক সাহাবায়ে কেরামের কাছ হতে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে জবাবে সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, 'ভাবধারায় যখন কোনো বিভিন্নতা নেই এ অবস্থায় কোনো ক্ষতি নেই।'

কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহ.) কোনো তাবিয়ীর নাম উল্লেখ করেননি। নাম জানলে এর ভিত্তি সুদৃঢ়, নাকি দুর্বল এর অনুমান করা যেত। সে যা হোক একথা অস্বীকার করা চলে না, কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম ভাব-ধারার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা জায়েয মনে করতেন এবং সেই অনুযায়ী আমলও করতেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম অন্য মত পোষণ করতেন।

## ভাব-ধারানুযায়ী রিওয়ায়াতের সতর্কতা

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাযকিরাতুল হুফ্ফায* কিতাবে এ বিষয় সাহাবায়ে কেরামের মতামত সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাঁরা রিওয়ায়াতে



কঠোরতা অবলম্বন করতেন। আর শাগরিদকে শাসাতেন যেন বেপরোয়াভাবে শব্দসমূহ উঠিয়ে দেওয়া না হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) যখনই ভাবধারার ভিত্তিতে রিওয়ায়াত করতেন তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) এ রকম বলছেন, এভাবে ফরমায়েছেন বা এর অনুরূপ বা এর সমজাতীয় বা এরচেয়ে কিছু কম বা বেশি বা এর কাছাকাছি ফরমায়েছেন ইত্যাদি বলতেন।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) যিনি লোকদেরকে হাদীস রিওয়ায়াতে নিষেধ করতেন তাঁর বাসনাও সম্ভবত তাই ছিল। তিনি জানতেন যে, সব শব্দ স্মরণ থাকে না। আর সর্বসাধারণকে ভাব অনুযায়ী রিওয়ায়াত করার আদেশ দিলে পরিবর্তন ও পরির্ধনের সম্ভাবনা থাকে। সাহাবায়ে কেরামের জমানার পরেও এসব সমস্যা সমাধান হয়নি। তাবিয়ীদের মধ্যে দুটি দল রয়েছে। পরবর্তী যুগে প্রায় জনপ্রিয় অভিমত ছিল যে, ভাব অনুযায়ী রিওয়ায়াত জায়েয। মুজতাহিদীনের মধ্যে এক সম্প্রদায় রয়েছে। ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.), কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রহ.), মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) ও আবদুল মালিক ইবনে ওমর (রহ.) তাঁদের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁরা শব্দসমূহসহ রিওয়ায়াতের পক্ষপাতী ছিলেন।

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, অধিকাংশ তাবিয়ীন ও সাহাবায়ে কেরাম ভাব অনুযায়ী রিওয়ায়াত করছেন। আর শুরু হতে যদি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতো তবে রিওয়ায়াতের ধারা এতো সংকীর্ণ হয়ে যেত যে, মাসায়িল ও আহকামের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। কিন্তু এতেও অস্বীকার করা চলে না যে, ভাব অনুযায়ী রিওয়ায়াত দ্বারা মূল রিওয়ায়াতের মৌলিকতা রক্ষা করা এমন কঠিন যে, এটি প্রায় অসম্ভব।

প্রত্যেকের কথা বলার ধারা এমন বিভিন্ন যে, একই কথা বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। আর ভাব অনুযায়ী কথা বললে কোনো না কোনো পার্থক্য অবশ্যই ঘটে থাকে। সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক কোনো ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শব্দসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলি অবগত নন। এটি নিঃসন্দেহে যে, তাঁরা উত্তম ভাষাবিদ এবং ভাষায় পণ্ডিতও বটে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্যলাভ হওয়ার কল্যাণে তাঁর ভাষা অনুযায়ী কথা বলায় তাঁরা অতুলনীয় ছিলেন। তা সত্ত্বেও হাদীসের কিতাবসমূহে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে কম বা বেশি হয়ে পড়ত।

## উদ্দেশ্য সাধনে সাহাবায়ে কেরামের কম বেশি

ইবনে মাজাহে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْـمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْـحَيِّ».

‘হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) নবী করীম (সা.) হতে রিওয়ায়াত করছেন যে, ‘মৃত ব্যক্তির প্রতি যদি কান্না করা হয় তবে তাকে আযাব করা হয়।’’[১]

কোনো এক ব্যক্তি হযরত আয়িশা (রাযি.)-কে বললেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) এ হাদীস বর্ণনা করছেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বললেন, আমি একথা বলি না যে, ইবনে ওমর (রাযি.) মিথ্যা বলছেন। তবে তাঁর ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। ব্যাপার হচ্ছে, এক স্ত্রীলোক মরে গিয়েছিল। তার স্বামী তার জন্য কান্না করছিল। আর কবরে তার ওপর আযাব হচ্ছে।

অপর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে যে, হযরত আয়িশা (রাযি.) কুরআনের আয়াত: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (একজনের বোঝা অপরজন বহন করবে না) একথা শুনে আপত্তি করলেন যে, একজনের কাজের জন্য যদি অপর দায়ী না হয়, তবে স্বামী যদি কান্না করে থাকে এটা তার অপরাধ। মৃতব্যক্তি তো কোনো পাপ করেনি যে, তার ওপর শাস্তি নিপতিত হবে?[২]

এখানে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ঘটনা প্রসঙ্গে এক স্ত্রীলোকের শাস্তিপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করছেন। রাবী কান্নাকে এর কারণ বলে মনে করেন। আর তিনি হাদীসের বাণী উদ্ধৃত করছেন, ‘জীবিতের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দান করা হয়েছে।’

## ভাব-ধারানুযায়ী রিওয়ায়াতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উসুল

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিভিন্ন অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এ সম্পর্কে নিতান্ত ন্যায়ের পথ অবলম্বন করেন। তাঁর সময়ের পূর্ব হতে যেসব হাদীস ভাব-ধারানুযায়ী রিওয়ায়াত করা হয়েছিল এবং মুহাদ্দিসীন যা প্রচার

[১] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫০৮, হাদীস: ১৫৯৪

[২] আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ১০২–১০৩, হাদীস: ১৬০৮



করে এসেছিলেন তা গ্রহণ না করার কোনো উপায় ছিল না। অন্যথায় রিওয়ায়াতের সবকিছু বিভাগ অচল হয়ে পড়ত। কাজেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সেসব হাদীস কবুল করলেন। কিন্তুতাৎপর্য ও উদ্দেশ্যাবলির সাথে সুপরিচিত হতে হবে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাৎপর্য গ্রহণের সম্ভবনা তাতেও পরিপূর্ণভাবে রয়ে গেল। বিপরীতমুখী কোনো দলীল পাওয়া না গেলে ভাব অনুযায়ী রিওয়ায়াত পন্থা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি পেল। যেসব হাদীসের রিওয়ায়াত বিশ্বাসযোগ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তা গ্রহণ করলেন। আর তাতে অনুভূতি-ধারার প্রতি সবিশেষ মনযোগ প্রদান করা হলো।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এসব নিয়ম সম্পর্কে অন্যান্য ইমামগণও একমত হলেন। আর ফিকহুল হাদীসে লিখিত রয়েছে যে, যেসব লোক শব্দাবলির মর্ম উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না হবেন তাঁদের পক্ষে শব্দসহ রিওয়ায়াত করা অবশ্যকীয়। আর যেসব লোক অনুমানের ওপর উদ্দেশ্য স্থির করে থাকেন তাঁদের সম্পর্কে অবশ্যই মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মত হচ্ছে, তাঁরা শব্দসমূহের অনুসারী নন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সেই অনুমতি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

আর অপরাপরদের নিমিত্ত শব্দসহ রিওয়ায়াতের বিধান করে দিয়েছে। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাওয়ী (রহ.) লিখছেন যে, শুধু সেসব হাদীস রিওয়ায়াত করতে হবে যা রিওয়ায়াত করার সময় স্মরণ থাকে। আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) সেই রিওয়ায়াতকে নকল করে লিখছেন যে, এর সারকথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ভাব অনুযায়ী রিওয়ায়াতকে জায়েয রাখছেন।

ইমাম মালিক ইবনে (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে একমত হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ রিওয়ায়াতকারীগণ এতো কঠোর পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী থাকতে পারেননি। কাজেই এক বিরাট দল ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরোধিতা করছেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে কঠোর রিওয়ায়াতকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবুও এটা সত্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা অত্যন্ত জরুরি। হাদীস শরীফেও আছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলছেন,

«نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ».

'আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করবেন যে ব্যক্তি আমার কাছ হতে কিছু শুনছে এবং তা হুবহু অপরের কাছে পৌঁছায়ে দিয়েছে।'[১]

এ সম্পর্কে এরচেয়ে উত্তম দলীলের আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা শব্দ শব্দ রিওয়ায়াতকে অনাবশ্যক ভেবে থাকেন তাঁদের কাছে বোধ হয় এই হাদীস পৌঁছেনি। যে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এটা প্রমাণিত হয়েছে, তিনি এ হাদীস শ্রবণ করছেন যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) এবং তিনি এই হাদীসের রাবী। তিনিও শব্দ শব্দ রিওয়ায়াতের পক্ষপাতী। হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানায় এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল।

## উসুল-অনুভূতি

হাদীস-বিষয় সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সর্বশ্রেষ্ঠ খেদমত হচ্ছে, তিনি দিরায়ত (অনুভূতি) সম্পর্কে বিধি-বিধান কায়েম করে গেছেন। রিওয়ায়াত ব্যাপারে আমাদের আলেমগণ যেভাবে মনোযোগ দান করছে অতীত ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত মিলবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, রিওয়ায়াতের সঙ্গে অনুভূতির ততোখানি সংযোগ রক্ষা করেননি। ইমাম হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.)-এর লেখা হতে বোঝা যায় যে, এই বিষয়ে কোনো কোনো গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখে গেছেন। কিন্তু তা স্বল্প এবং আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়।

উসুলে হাদীস একটি বিশিষ্ট বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে বড় বড় গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অনুভূতির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ হাদীসশাস্ত্রে এটি সবিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। একা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ গৌরব অর্জন করছেন। তাঁর পূর্বে এটা নাম নিশানও ছিল না, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সূক্ষ্মদৃষ্টি যথাসময়ে তৎপ্রতি নিপতিত হলো।

এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, সাহাবায়ে কেরামের সময়েই এর কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর জন্য দলীলস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু তা অন্যান্য সমস্যার নীচে এভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল যে, তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। এর

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৫, পৃ. ৪৬৭, হাদীস: ২১৫৯০



সকল রাবী জবরদস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ঘটনা সত্য নয়, হাদীসে এ রকম অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এজন্য এটি আবশ্যক যে, শুধু রিওয়ায়াতের ভিত্তি দ্বারা হাদীসের মীমাংসা ঠিক না, বরং এটাও দেখা উচিত যে, তা উসুলের দিরায়ত মুতাবিক কিনা।

দিরায়াত (বুদ্ধিমত্তা) হচ্ছে, যখন কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয় তখন চিন্তা করা আবশ্যক যে, মানুষের স্বাভাবিক বাসনা-কামনা কি এবং সমসাময়িক প্রয়োজন কি! এসবের সাথে যদি খাপ না খায় তবে তা সন্দেহজনক। অর্থাৎ তখন বুঝতে হবে যে, রিওয়ায়াতে উলট-পালট হয়েছে এবং মূল ঘটনা বিকৃত হয়ে গেছে। হাদীসের এ জাতীয় তত্ত্বানুসন্ধান ও সংশোধনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এটিকেও রাসুলের রিওয়ায়াত বলা হয়।

হাদীস-শাস্ত্র বিশারদ হাফিয ইবনুল জাওযী (রহ.) লিখছেন, যে হাদীসকে আপনি বুদ্ধির বিরোধী দেখতে পাবেন বা যা যদি উসুল-বিরোধী হয় তবে বুঝতে হবে যে, তা মওযু' বা বানোয়াট। সেই সম্পর্কে অপর হাল-হাকীকত জানার প্রয়োজন নেই। আর তা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বহির্ভূত হয় তবে তাও মওযু' বা বানোয়াট।

## যে হাদীস অকাট্য বুদ্ধির বিরোধী তা সহীহ নয়

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) সমগ্র উসুলে দিরায়তে শত প্রকার বোঝাতে চেষ্টা করছেন, যে হাদীস সুস্পষ্ট বুদ্ধির বিরোধী তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেই সময়ে ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। আর দার্শনিক ভাবধারা জন-বোধগম্য হয়েছিল। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানা পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে বুদ্ধির নাম নেওয়া এক মহাপাপ বলে বিবেচিত হতো। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন প্রথম এই পথ অবলম্বন করতে চাইলেন এবং রিওয়ায়াতকে সুপরিচালিত করার জন্য চেষ্টা করলেন তখন তাঁকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে চেয়েছিল।

এমন হাদীস যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সম্মুখে পেশ করা হতো যা অসম্ভব এবং পরিস্থিতির খেলাফ তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তা গ্রহণ করতেন না। জনসাধারণ এসব বরদাস্ত করে ওঠতে পারত না। রিওয়ায়াত সম্পর্কিত হাল-অবস্থা দ্বারা তারা রিওয়ায়াতকে জানতে বুঝতে ও সংশোধন করতে প্রয়াস পেত। উসুলে দিরায়তের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ

ছিল না। অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠিতে সবকিছুকে যাচাই করা তাদের অভ্যাসগত ব্যাপার ছিল না। পরবর্তী কালে যদিও তা উসুলে হাদীসে স্থান পায় তবুও রিওয়ায়াত প্রধানগণ তৎপ্রতি গভীর গুরুত্ব প্রদান করেননি।

'এই ভূত অত্যন্ত সম্মানী এবং এর শাফায়াতের আশা করা যায়' এ রকম কথা বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভূতের প্রশংসা করছেন বলে প্রচারিত রয়েছে। অনেকের ধারণা, উক্ত বাণী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কানে শয়তান ঢেলে দিয়েছিল। তিনি এটা পাঠ করার পর হযরত জিবরীল (আ.) এসে অভিযোগ করলেন। আমি তো আপনাকে এটা শিক্ষা দেইনি? আপনি কোথা হতে এটা পাঠ করলেন?

এ হাদীসকে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর উসুল অনুযায়ী ইমাম কাজী আয়ায (রহ.) ও ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীন ভুল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসদের এক বিরাট দলও এখনও একে সহীহ বলে মতামত পেশ করেন। পরবর্তীকালে ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.)-এর চেয়ে অধিক বিখ্যাত মুহাদ্দিস অপর কেউই ছিলেন না। তিনি বড় জোরেসোরে এ হাদীসের সমর্থন করছেন। তিনি বলেন, এর রিওয়ায়াতকারী বিশ্বাসযোগ্য কাজেই একে অস্বীকার করা চলে না।

একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন হযরত আলী (রাযি.)-এর আসরের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুআর ফলে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আবার তা উদিত হয়। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) এটাকে মওযু' বা বানোয়াট বলে মন্তব্য করছেন। কিন্তু হাফিয ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জালালউদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) প্রমুখ অনেকে এর ঘোর প্রতিবাদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিরোধিতা করছেন। কিন্তু অনেক ইমাম এটা গ্রহণ করেছেন।

## হাদীস ও কিয়াস

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণনা হতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীসের মুকাবেলায় তিনি কিয়াসের প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করতেন না। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)-এর অভিমত হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যদি রমযান মাসে ভুলে কিছু পানাহার করে ফেলে, তবুও রোযা বিনষ্ট হবে না। এবং এর কাযাও করতে হবে না। হ্যাঁ, এটি সত্য যে, হাদীসের প্রামাণিকতার



ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অত্যন্ত শক্ত ছিলেন। হাদীসের শর্তাবলি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তা কবুল করতেন না। আর শর্তাবলি অনুযায়ী হাদীস প্রমাণিত হলে কিয়াসের প্রতি তিনি কোনোই গুরুত্ব প্রদান করতেন না।

## কিয়াসের বিভিন্ন অর্থ

আমি যতোখানি তত্ত্বানুসন্ধান করতে পেরেছি, তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হচ্ছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কস্মিনকালেও হাদীসের চেয়ে কিয়াস ও ফিকহের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেননি। কিন্তু তাঁর সময় পর্যন্ত কিয়াস শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। আর এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কিয়াস শব্দের এ ব্যাপকাতর দরুনই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কিয়াসকে হাদীস নির্বাচনকারী হিসেবে গ্রহণ করেন।

মাসায়িল ও আহকামে শরীয়তের ব্যাপারে ইসলামি জগতে প্রথম হতেই দুইটি গল্প গড়ে ওঠেছিল। এক দলের বিশ্বাস হচ্ছে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম কোনো মঙ্গল ও জ্ঞান-বুদ্ধির সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। অপর দলের বিশ্বাস হচ্ছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে কতগুলোর মঙ্গল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর এমন কতগুলোও রয়েছে যে, এর মঙ্গলের ব্যাপারে আমরা আদৌ অবগত নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাও মঙ্গলশূন্য নয়।

এসব বিভিন্ন মতবিরোধের কারণে হাদীস রিওয়ায়াতের বিভিন্ন ধারা প্রচলিত রয়েছে। এমনও অনেকে রয়েছেন যে, যখনই তাঁরা কোনো হাদীস শুনেন তখন তাঁরা এতটুকু লক্ষ্য রাখেন যে, এর রিওয়ায়াতকারী বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তাঁদের ধারণা মতে তা যদি গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণসাপেক্ষ হয়ে থাকে, তখন তাঁরা অপর কোনো কিছুর জন্য চিন্তা না করে অতিঅনায়াসে হাদীস গ্রহণ করে থাকেন।

অপর যে দল জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন তাঁরা দেখেন যে, মাসআলা হাদীসের আকীদা অনুযায়ী টিকে কিনা এবং তা বুদ্ধি ও মঙ্গলরসে ভরপুর কিনা। সেই গুণ যদি তাতে না থেকে থাকে তখন তাঁরা সেই হাদীসগুলো সম্পর্কে অধিক তত্ত্বানুসন্ধান নিয়ে থাকেন এবং তা সংশোধন ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টাসাধ্য করে থাকেন। রাবী বুদ্ধিমান কিনা এবং রিওয়ায়াত ব্যাপারে তাঁর কতখানি মর্যাদা রয়েছে তা শব্দ শব্দ রিওয়ায়াত করা হয়েছে, কাকে লক্ষ করে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তখন পারিপার্শ্বিকতা কি

রকম ছিল মোটকথা এ জাতীয় কার্যকারণ ও ভিত্তিভূমির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।

## তাহকীক ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার পন্থা

*সুনানে ইবনে মাজাহ* ও *সুনানে তিরমিযী*তে উল্লেখ রয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَوَضَّئُوْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ».

'হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে হাদীস রিওয়ায়াত করছেন, 'আগুন যে বস্তুকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে তা ব্যবহার করলে অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে।''[১]

এজন্য কোনো কোনো মুজতাহিদের মত হচ্ছে, গোস্ত খেলেও অযু করতে হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) যখন এ হাদীস বয়ান করছিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ হাদীসের ভিত্তিতে তো গরম পানি ব্যবহার করলেও অযু নবায়ন করতে হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বললেন, হে ভ্রাত! আল্লাহর রাসূল (সা.) হতে যখন কোনো রিওয়ায়াত শুনতে পান, তখন এর ওপর কোনো দৃষ্টান্ত দেবেন না।[২]

এরপরও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) নিজের অভিমতের ওপর স্থির রইলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত, 'কোন মৃত ব্যক্তির আত্মীয় রোদন করলে মৃতব্যক্তি শাস্তির ভাগী হবে।' হযরত আয়িশা (রাযি.) এর প্রতিবাদ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে।[৩]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এ রকম মতই ছিল। লোকেরা তাঁর এ মতামতকে কিয়াস নামে আখ্যা প্রদান করছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.)-এর অতুলনীয় কিতাব এই বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট। এখানে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (রহ.) ও শাহ

[১] (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৪৮৫; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ১, পৃ. ১১৪, হাদীস: ৭৯

[২] (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৪৮৫; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ১, পৃ. ১১৪, হাদীস: ৭৯

[৩] আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ১০২–১০৩, হাদীস: ১৬০৮



ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) প্রমুখ মহাজ্ঞানী ওলামায়ে ইসলামেরও একই অভিমত ছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস সংশোধনের ব্যাপারে এই নিয়মকে অতিআবশ্যক বোধে বহাল রেখে দিয়েছেন। এমন দুটি হাদীস যদি রিওয়ায়াত হিসেবে সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায় তবে এর মধ্যে সেই হাদীসটির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে যা উল্লিখিত উসুল অনুযায়ী টিকে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সময় সময় শুধু এই উসুলের সাথে খাপ না খাওয়াতে কোনো কোনো হাদীসকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করছেন।

হাদীস যাচাই-বাছাই কোনোটাই সহজ-সরল কাজ নয়। এটি দুনিয়াদারির ব্যাপার নয়। দুনিয়া ব্যতীত অপর কোনো কিছুর সাথে মুহাদ্দিসীনের যোগাযোগ থাকে। একে একপ্রকার ইলহাম বলা হয়। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) খুব নামজাদা মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর ভাষ্য হচ্ছে, 'এটি এক প্রকার ইলহাম। বাইরের কোনো লোক যদি এর দলীল চায় তবে তা পেশ করা সম্ভবপর হবে না।

এক ব্যক্তি মুহাদ্দিস ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.)-এর কাছে কয়েকটি হাদীস জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তার মধ্যে কিছুকে প্রচলিত কথা, কিছুকে বাতিল, কিছুকে অগ্রাহ্য এবং কিছুকে সহীহ বললেন। প্রশ্নকারী বললেন, আপনি কিভাবে তা বুঝতে পারলেন? এসব হাদীসের রাবী কি এ সম্পর্কে আপনাকে কোনোকিছু জ্ঞাপন করেছেন? ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.) বললেন, না, বরং আমি এভাবেই বুঝে নেই।

প্রশ্নকারী বললেন, তবে কি আপনি গায়েবের খবর জানেন বলে দাবি করে থাকেন? ইমাম ইবনে আবু হাতিম জবাবে বললেন, আপনি অন্যান্য মুহাদ্দিসদের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তাঁরা যদি আমার সাথে একমত হন তবে বুঝতে হবে যে, আমি অসমীচীন কিছুই বলিনি। সেই প্রশ্নকারী ইমাম আবু যুরআ (রহ.)-এর কাছে গিয়ে সেসব হাদীস জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও হুবুহু ইমাম ইবনে আবু হাতিমের মত বললেন। তখন প্রশ্নকারী শান্ত হলেন।

মুহাদ্দিসদের কেউ কেউ বললেন, এটি একটি ভাবধারা। তা হাদীসের ইমামের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি তা প্রবাহিত করতে পারে না। মুহাদ্দিসদের এসব দাবি সম্পূর্ণ সত্য। এটি সন্দেহাতীত যে, রিওয়ায়াতকারীদের মধ্যে এমনই একটি প্রেরণা জাগে যা দ্বারা তাঁরা নিজেরাই

বুঝতে পারেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী কিনা। শরীয়তের আহকাম, মাসায়িল, রহস্য ও মঙ্গলের অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে তাঁদের অন্তরে এমন একটি প্রেরণা জাগে যে, তাতে তাঁরা এটি আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর বাণী কিনা তা স্বাচ্ছন্দে উপলব্ধি করতে পারেন।

কিন্তু এসব রহস্য এবং মঙ্গলের অনুকরণ-অনুসরণ মুহাদ্দিসদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করেই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কিছু হাদীসকে গ্রহণ করছেন এবং কিছু হাদীসের বিরোধিতা করছেন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বুদ্ধির মাপকাঠিতে হাদীসের রদ করে থাকেন।

মোটকথা হচ্ছে, হাদীস গ্রহণ ও রদ করা সম্পর্কে যে রকম জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মধ্যে সেসবের কোনোকিছুই অভাব ছিল না। তবে সত্য কথা হচ্ছে, এটি অতিসূক্ষ্ম কর্তব্য ও গুরুদায়িত্ব পরিপূর্ণ কাজ। অতিবড় আলেম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, ফিকহবিদ এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্যপুষ্ট লোক ব্যতীত অপর কারও পক্ষে এ কাজের ভাব গ্রহণ শোভা পায় না এবং ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এই সম্পর্কিত সর্বগুণে ভূষিত ছিলেন।

## হাদীসের স্তরসমূহ ও পার্থক্য

হাদীসাবলির স্তরসমূহ নির্ণয় এবং সকলের সম্মুখে তার পার্থক্য স্পষ্ট ও প্রকট করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বর্ণনাতীত জ্ঞান-গরিমা, সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি প্রদর্শন করছেন। শরীয়তের হুকুম-আহকাম এবং মাসায়িল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কুরআন শরীফকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আধার বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর নির্বাচন যে অকাট্য ও ধ্রুব এটি সন্দেহাতীত।

কুরআনের পরই তিনি হাদীসের স্থান দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে মৌলিকতার দিক দিয়ে খুব বেশি পার্থক্য নেই। হযরত জিবরীল (আ.)-এর মারফত কুরআন নাযিল হয় এবং তিনি স্বয়ং তা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে শোনান। হাদীসও অহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে হযরত জিবরীল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পাঠ করে শোনাননি। এজন্য কুরআনকে 'অহীয়ে মতলু' এবং হাদীসকে 'অহীয়ে গায়েব মতলু' বলা হয়।



প্রামাণ্যের দিক দিয়েই স্তরবিন্যাসেও মতবিরোধ রয়েছে। কোনো হাদীস যদি অকাট্য প্রমাণের দিক দিয়ে কুরআনের ন্যায় প্রমাণিত হয় তবে আদেশ নির্ধারণে তা কুরআনের সমকক্ষ। কিন্তু প্রমাণের দিক দিয়ে হাদীসের বহু স্তর রয়েছে। কাজেই আদেশ নির্ধারণে এসব স্তরবিন্যাসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মশহুর, আযীয ও গরীব ইত্যাদি হাদীসের যেসব স্তর রয়েছে এসব স্তর বিভিন্ন হলেও এর প্রত্যেকটিরই আদেশ নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে।

মুহাদ্দিসীন যয়ীফ হাদীসের প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন না। এছাড়া তাঁরা অপরাপর সবগুলোকেই প্রায় কাছাকাছি গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। মুহাদ্দিসীনের পক্ষে এসবের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা আদেশ নির্বাচন ও মাসায়িলের শ্রেণিবিভাগ তাঁদের জন্য ফরয নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন। এজন্য তাঁর পক্ষে অধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও শ্রেণিবিভাগের পার্থক্য প্রদর্শন প্রয়োজনীয় ছিল। প্রকারভেদে তিনি হাদীসকে মুতওয়াতির, মশহুর ও আহাদ এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন।

## মুতাওয়াতির

অসংখ্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ হতে যেসব হাদীস রিওয়ায়াত করছেন এবং তা মিথ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আর সেসব লোক হতে আরম্ভ করে আখেরী জমানা পর্যন্ত অসংখ্য লোক তা রিওয়ায়াত করতে থাকবে তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়।

## মশহুর

যেসব হাদীস প্রথম তাবকা বা পর্যায়ে অতিকম রিওয়ায়াত কিন্তু দ্বিতীয় তাবকা হতে শেষ সময় পর্যন্ত এত অধিক পরিমাণে রিওয়ায়াত হতে থাকবে যে, মুতাওয়াতির হাদীস এবং মশহুর হাদীস একই শর্তাধীনে হয়ে পড়ে।

## আহাদ

যা মুতাওয়াতির ও মশহুর হাদীসের অনুরূপ নয়। মুতাওয়াতির দ্বারা ফরয প্রমাণিত হয় না। কিন্তু কুরআন শরীফে যেসব হুকুম মুতলক রয়েছে মশহুর হাদীস দ্বারা তা নির্দেশিত হয়ে থাকে। হাদীসে সুস্পষ্ট কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এবং কোনো কোনো মুহাদ্দিসীন এর বিরোধিতা করছেন।

এ মাসআলা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা কঠোর প্রতিবাদ এই হয়েছে যে, স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ এ মাসআলার অনুসরণ করেননি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* কিতাবে লিখেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের রায় মতে কি খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা যায় না? ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বললেন, হ্যাঁ, তা পারা যায়। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বললেন, কুরআন মজীদে উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে অসিয়তের আদেশ রয়েছে। কিন্তু আপনার হাদীসে ওয়াহিদ দ্বারা উত্তরাধিকারের জন্য অসিয়ত করাকে কিভাবে নাজায়েয বলে সাব্যস্ত করলেন?[১]

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর গুণাবলি সম্পর্কে ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকী (রহ.) যে রিওয়ায়াত করেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) সম্ভবত সেই রিওয়ায়াত হতে তা গ্রহণ করেছেন। সেখানে আরও অন্তহীন রিওয়ায়াত রয়েছে। কিন্তু আমরা শাহ সাহেবের খেদমতে আরজ করেছি যে, হানাফীদের কাছে কোনো হাদীস দ্বারাই উত্তরাধিকারীদের অধিকার বিনষ্ট হয় না। এটি শুধু হানাফীদের অভিমত নয়, বরং সকল তফসীরকারদেরও মত তাই।

এ মাসআলা সম্পর্কে আরও শত-সহস্র তর্কের উদ্রেক হয়েছে। আমরা এখানে এর বিস্তৃত বিবরণ দিতে চাই না। কিন্তু আখবারে আহাদ সম্পর্কে তর্ক এবং এটি দ্বারা আকায়িদে ইসলামে যা কিছু প্রভাব পড়েছে এখানে আমরা তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করছি।

## আখবারে আহাদ সম্পর্কে দুটি কথা

আখবারে আহাদ সম্পর্কে যদিও মুহাক্কিকীন ও অধিকাংশ হাদীসের ইমামদের এটিই হচ্ছে অভিমত, তবুও একটি দল এর বিরোধিতাও করছেন। ইমাম ইবনুস সালাহ (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আখবারে আহাদের সকল হাদীসের অকাট্যতা স্বীকার করেননি, তিনি সহীহ হাদীসকে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করছেন। যথা–

১. যে সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) একমত হয়েছেন।

[১] শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, ***হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা***, খ. ১, পৃ. ২৫২



২. শুধু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মত।
৩. শুধু ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.)-এর মত।
৪. ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) তা রিওয়ায়াত করেননি। কিন্তু শর্তাবলির সাথে তাঁরা এক মতাবলম্বী।
৫. তা শুধু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী।
৬. তা শুধু ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী।
৭. তা ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.)-এর শর্তাবলির নয়, কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসীন এসবকে সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন।

এই সাত শ্রেণির ইমাম ইবনুস সালাহ (রহ.) প্রথমটিকে অকাট্য বলে স্বীকার করছেন। ইবনুস সালাহ (রহ.)-এর উক্ত মত যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে এবং বিশেষভাবে আজকাল বহু লোকের সমর্থন লাভ করছে তবুও নিঃসন্দেহ যে, এটি ভুল এবং এর পেছনে কোনো দলীল নেই। আর স্বয়ং হাদীসের ইমামগণ এর বিরোধী।

ইমাম শরফুদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী (রহ.) *সহীহ মুসলিমের* ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুস সালাহ (রহ.)-এর বাণী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখছেন, শায়খ ইবনুন সালাহ (রহ.) এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলছেন তা মুহাক্কিকীন ও অন্যান্য অধিকাংশ লোকের মতের বিরোধী। কেননা তা আখবারে আহাদ সম্পর্কে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তা হতে শুধু ধারণার উদ্রেক হয় এবং এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) এবং অন্যান্য সকলে বরাবর। ইবনুস সালাহ (রহ.)-এর বাণীকে অন্যান্য শাস্ত্রবিশারদ ইমামগণও রদ করছেন। কিন্তু আমরা তা শুধু মৌখিকভাবে মীমাংসা করতে চাই না। আমাদেরকেও চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আখবারে আহাদ দ্বারা ইয়াকীন পয়দা হয়, নাকি ধারণার উদ্রেক হয়।

## হাদীসকে ধারণামূলক বলার কারণসমূহ

যেকোনো পর্যায়ের কোনো মুহাদ্দিস যখন কোনো একটি হাদীসকে সহীহ বলেন তখন তাঁর দাবি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যথা–

১. রিওয়ায়াত ধারাবাহিক হওয়া চায়,

২. তাঁর রিওয়ায়াত বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চায়,

৩. ধীর বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া চায় এবং

৪. রিওয়ায়াত এমন হওয়া চায় না যে, অতিকম লোক তা রিওয়ায়াত করছেন।

এসব ধারণামূলক ও ইজতিহাদমূলক। এসবকে ভিত্তি করেই ইয়াকীন গড়ে ওঠে। কোনো একজন ফকীহ যখন কুরআন বা হাদীস হতে কোনো মাসআলা নির্বাচন করে নেন এবং স্বীয় ধারণা অনুযায়ী সহীহ বলে ধারণা করে নেন তা বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। কারণ যেসব কার্য-কারণের ওপর নির্ভর করে ইয়াকীন করা হয় তা সমুদয় ধারণামূলক।

হাদীসের অবস্থাও তাই। কোনো হাদীসকে সহীহ বলতে হলে মুহাদ্দিসকে ধারণা ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। কোনো একজন বা কতিপয় মুহাদ্দিস যদি কোনো হাদীসকে সহীহ বলেন এবং অপর ব্যক্তি এর অকাট্যতা যদি স্বীকার না করেন তবে সেই ব্যক্তি এতোটুকু পাপী হবে যে, সেই ব্যক্তি সেই মুহাদ্দিসীনের অনুসন্ধান-ধারা, নির্বাচন-পদ্ধতি ও রিওয়ায়াত-পন্থা মোটকথা তাঁদের ইজতিহাদের বিরোধী।

হাদীসের তত্ত্বানুন্ধান ও সংশোধনের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন যেসব বিধি-বিধান অনুযায়ী চলে থাকেন এবং সেসবের ওপর নির্ভর করেই হাদীসের স্তরসমূহ নির্ণীত হয়ে থাকে তার সবই বুদ্ধিপ্রসূত এবং ইজতিহাদী মাসায়িল। এর কারণ হচ্ছে, স্বয়ং মুহাদ্দিসীনের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ থাকায় বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন লোকের ধারণা হচ্ছে, হাদীসশাস্ত্র একটি নফল বিষয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উসুলে হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করেন তিনি সেই ভ্রম ধারণাকে অনায়াসে বুঝতে পারেন।

## দুরস্তি-ক্রটি সম্পর্কে মতবিরোধ

ধারণা ও ইজতিহাদের ওপর উসুলে হাদীস নির্ভরশীল হওয়ার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মুহাদ্দিসদের মধ্যে হাদীসসমূহের দুরস্তি এবং এর ক্রটি সম্পর্কে আপোসের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এক হাদীসকে একজন মুহাদ্দিস অত্যন্ত সহীহ, সনদযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য মনে করে থাকেন। অপর মুহাদ্দিস তাক যয়ীফ, বরং মওযু' বলে থাকেন। মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (রহ.) বহু হাদীসকে মওযু' বলে সাব্যস্ত করছেন। অথচ অপরাপর মুহাদ্দিসীন



সেসবকে সহীহ ও হাসান বলছেন। *সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমের* হাদীস ব্যতীত অপরাপর বহু হাদীসকে ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) মওযু' বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করছেন।

ইমাম শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়ী (রহ.) লিখছেন, *সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমেও* যেসব উল্লেখ করছেন। নিশ্চয় ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) ভুল করছেন। কিন্তু সেই ভুলকেও ইজতিহাদী ভুল বলতে হবে। এমনকি *সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমের* ইজতিজাদকেও ভ্রমাত্মক বলছেন। সেই উসুলী মতবিরোধিতার ফলে হাদীসমূহের দুরস্তি ও ক্রটি সম্পর্কে যা কিছু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তা লিপিবদ্ধ করলে এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত জারি হলে তাকে হাদীসে মরফু বলা হয়। কিন্তু সংলগ্ন হওয়ার যে তরীকা নির্দিষ্ট রয়েছে তার মধ্যে প্রায়গুলোই ধারণামূলক ও ইজতিহাদী। 'এ কাজটি সুন্নত' অনেক সাহাবায়ে কেরামকে এভাবে বলতে শোনা যায়। আবার অনেকে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জমানায় আমরা এ রকম কাজ করতাম।' কেউ কেউ বলেন, 'আমরা অমুক কাজকে মন্দ জানতাম।' অনেকে এতোদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন যে, সেসব হাদীসে এসব শব্দ ছিল সেসবকে শব্দসহ রিওয়ায়াত করে বলছেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) এ রকম বলছেন। অথচ সেসব শব্দ অকাট্য ছিল না। বরং তা সাহাবায়ে কেরামের ধারণা ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে এসবকে তসলীও করা হয়েছে।

অনেকে বলছেন, 'সাহাবায়ে কেরামের বুঝ কোনো দলীল নয়।' এ সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম মতবিরোধ করছেন। আর এও বলছেন যে, এসব দ্বারা একথা বোঝা যায় না যে, তা রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত জারি ছিল। ইমাম শাফিয়ী (রহ.), ইমাম ইবনে হাযম আয-যাহিরী (রহ.) এবং অপরাপর মুহাক্কিকীন সাহাবায়ে কেরামের বাণী 'এই কাজটি সুন্নত'-কে 'হাদীস মরফু' বলে স্বীকার করেননি। হাদীসে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে সাহাবায়ে কেরাম এসব শব্দ ব্যবহার করছেন। সেসব হাদীস নববী ছিল না, বরং তা তাদের কিয়াস ও ইজতিহাদ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন এসবকে হাদীসে মরফু বলছেন। সেই ধারণা এ বিপদ ডেকে এনেছে যে, এসবকে কোনো কোনো রিওয়ায়াতকারী হাদীসে মরফু বলে জারি করে দিয়েছে। তাতে একটি সাধারণ সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে।

## একভাবাপন্ন হাদীস

এই জাতীয় বহু হাদীস রয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভিমত হচ্ছে, একভাবাপন্ন হাদীসের মধ্যে যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, রিওয়ায়াতকারী ও যার কাছে রিওয়ায়াত করা হয় উভয়ে যদি এক ভাষা-ভাষী হন এবং তাঁদের মধ্যে মাঝে-মাঝে সাক্ষাৎ লাভও ঘটে, তবে সেই হাদীসকে ধারাবাহিক হাদীস বলে বিবেচনা করতে হবে।

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। আর তিনি অধিক পরিমাণে তাঁরই অনুসরণ করতেন। তবুও তিনি কঠোরভাবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তের প্রতিবাদ করছিলেন। তিনি এক ভাষাবিদ হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। এ বিরোধিতার ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উসুল অনুযায়ী ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সকল একভাবাপন্ন রিওয়ায়াত যাতে সাক্ষাৎ লাভের প্রমাণ নেই এর কোনোটাই ধারাবাহিক নয় বলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ধারণা ছিল। অথচ ইমাম মুসলিম (রহ.) এসবকে ধারাবাহিক মনে করতেন। আর এতে তিনি এমন জোর দিতেন যে, তাঁর বিরোধী দলকে তিনি নিন্দা করতেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) এ সম্পর্কে খুব উদারতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ীও একভাবাপন্ন রিওয়ায়াত ধারাবাহিক হওয়ার প্রমাণ শুধু ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটি অপরিহার্য ছিল না যে, দুই ব্যক্তি একই ভাষাবিদ হবে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে। কিন্তু যেখানে রিওয়ায়াতকারী শব্দ দ্বারা রিওয়ায়াত করবেন, তখন তা ধারাবাহিক হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু তা ইয়াকীনী বা নিশ্চিত বলা চলবে না। হাদীস ও জীবন-চরিতে এ রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, দু'জন রিওয়ায়াতকারী একই জমানায় ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আপোষে সাক্ষাৎ ঘটত। তবুও একজন অপরজনের মধ্যস্থতায় রিওয়ায়াত করছেন।

## লোক-যাচাই

সর্বাপেক্ষা জরুরি এবং কঠিন প্রশ্ন, লোক-যাচাই। আখবারে আহাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে, লোক। কিন্তু লোক-নির্বাচন ও লোক-যাচাই এমনই একটি বাধ্যতামূলক ব্যাপার যে, যার চুল-ছেঁড়া মীমাংসা কঠিন ব্যাপার। আর এর সঠিক কোনো মাপকাঠিও নেই। বহু লোক কোনো একজন লোককে অত্যন্ত



বিশ্বাসযোগ্য, অত্যন্ত ধর্ম-পরায়ণ ও অত্যন্ত সত্যপরায়ণ ভেবে থাকে। আবার সেই লোকটিকেই বহু লোক দুর্বল রিওয়ায়াতকারী, অবিশ্বাসী এবং অনুপযুক্ত ভেবে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, লোকটি যে উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মধ্যে তেমন কোনো ঘোর মতবিরোধ নেই।

তবুও রিওয়ায়াত ব্যাপারে এমনও দেখা গেছে যে, তাঁদের একজন যে রিওয়ায়াতকে গ্রহণযোগ্য ভাবছেন অপরজন তা বর্জনীয় বলছেন। ইমাম শরফুদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী (রহ.) *সহীহ মুসলিমের* ভূমিকায় এমন কয়েকজনের নামও লিপিবদ্ধ করছেন এবং মুহাদ্দিস আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.)-এর *আল-মুদখাল* হতে রিওয়ায়াত করছেন যে, এমনও বহু লোক রয়েছেন ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর *আল-মুসনাদুস সহীহে* যাঁদেরকে বর্জন করছেন, কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর *আল-জামিউস সহীহে* তাঁদেরকে গ্রহণ করছেন।

## রিওয়ায়াতের ত্রুটি ও শুদ্ধি সম্পর্কে মতবিরোধ

এ রকম অসংখ্য রিওয়ায়াত রয়েছে, ত্রুটি ও শুদ্ধতা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে এবং এর পিছনে যুক্তিও রয়েছে। কারও দোষ-গুণ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং যা রিওয়ায়াতকে শক্তিশালী বা দুর্বল করবে তা আয়ত্ত করতে হলে রিওয়ায়াতকারীর সাথে তখন পরিচয় এবং অভিজ্ঞতা আবশ্যক। যাঁরা এ সম্পর্কিত দোষ-গুণ অনুসন্ধানে বিব্রত থাকেন তাঁদের পক্ষে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ রিওয়ায়াত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এজন্য বিভিন্ন পন্থা, বাহ্যিক প্রকাশ্য ভালো-মন্দ, জন-প্রচার এবং শোনা গেছে এমন রিওয়ায়াতের ওপরই অধিক নির্ভর করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে অতিকম অকাট্য চূড়ান্ত মীমাংসা করা চলে।

মুহাদ্দিসীন এসব মতবিরোধের অবসানকল্পে বহু আইন-কানুনের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু সেসব বিধি-বিধান মূলেই ইজতিহাদী এবং মতবিরোধ সংবলিত। এছাড়াও বহু ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীন স্বয়ং স্বীয় উসুল সম্পর্কেও মত পরিবর্তন করছেন। আর অনেকে গুণের চেয়ে দোষকেই অধিক বড় করে দেখেন। কিন্তু এমনও বহু রিওয়ায়াত রয়েছে, যেখানে এসব বিধি-বিধান কোনোটাই প্রয়োগ করা চলে না। মুহাম্মদ ইবনে বশর আল-মিসরী (রহ.),

আহমদ ইবনে সালিহ আল-মিসরী (রহ.) ও ইকরামা মওলা ইবনে আব্বাস (রহ.) সম্পর্কে একাধিক ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু তাঁদের সেই ত্রুটি ধর্তব্য হয়নি।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ত্রুটিহীন ও ত্রুটিপূর্ণ উভয় প্রকার লোক রিওয়ায়াত-শাস্ত্রের ইমাম হয়ে থাকেন। আর তাঁদের অভিমত সম্পর্কে এ রকম মতবিরোধ ঘটনা থাকে যে, তাতে আশ্চর্যের আর পরিসীমা থাকে না। জাবির আল-জু'ফী আল-কুফী সম্পর্কে বিভিন্ন ইমাম যে বিভিন্ন মতামত পেশ করছেন নিম্নে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বলেন, হাদীস সম্পর্কে জাবিরের চেয়ে আমি অপর কাকেও অধিক সতর্ক লোক দেখিনি। ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-আযদী (রহ.) বলেন, জাবির যখন বলেন তখন মানুষের জন্য তা দলীল হয়ে যায়। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-আযদী (রহ.)-কে বললেন, আপনি যদি জাবির আল-জু'ফী সম্পর্কে কোনো দোষারোপ করেন তবে আমি আপনার সম্পর্কেও দোষারোপ করব।' ইমাম ওয়াকী' বলেন, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তবে অন্য কারও সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন, কিন্তু জাবির আল-জু'ফী যে বিশ্বাসযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না। অথচ অন্যান্য ইমামগণ তাঁরই সম্পর্কে অভিমত পেশ করছেন যে, জাবির আল-জু'ফী সমাজ বিতাড়িত, মিথ্যাবাদী এবং বাজে লোক। বহু মুহাদ্দিসীনই এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, জাবির রিওয়ায়াত করার উপযুক্ত লোক নন।[১]

## উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা

মনে করুন, একটি হাদীস সকল মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদের উসুল অনুযায়ী ধারাবাহিক রিওয়ায়াতও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু বর্ণনাকারী উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছেন কিনা তা বিশেষ লক্ষ করার বিষয়। পারিপার্শ্বিকতা, সম্ভাব্যতা ও রিওয়ায়াতের সম্পূর্ণ শর্ত পালন হলো কিনা, উদ্দেশ্য প্রকাশে কোনো ত্রুটি রইল কিনা বা নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ কোনো ত্রুটি হলো কিনা এসব বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়।

কেননা এটি সর্বসম্মত যে, প্রায় হাদীসই ভাব-ধারানুযায়ী রিওয়ায়াত করা হয়। কাজেই পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ না হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়।

[১] আয-যাহাবী, ***মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল***, খ. ১, পৃ. ৩৭৯, হাদীস: ১২২৫



সাহাবায়ে কেরামের জমানায় যদি কোনো রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অস্বীকার করা হতো। অন্যথায় একথা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম সাধারণভাবে বিশ্বাসযোগ্য। আর তাঁদের রিওয়ায়াতের মধ্যে কোনো প্রকার যোগহীনতার অভাব পরিলক্ষিত হতো না।

*সহীহ মুসলিমের* এতীমের অধ্যায়ে এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গোসলের আবশ্যক হয়েছে, কিন্তু পানি পাচ্ছি না। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, নামায পড়াবেন না। হযরত আম্মার (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই মাসআলা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা.) হতে একটি রিওয়ায়াত করলেন এবং বললেন যে, তখন আপনিও সেখানে ছিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর।

এটি স্পষ্ট যে, হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আম্মার (রাযি.)-কে মিথ্যা রিওয়ায়াতকারী বলে বিবেচনা করেননি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে, উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে আদায়ে যেন কোনো ভুল না হয়। কাজেই তিনি তাঁকে সতর্কতা মূলকভাবে তা বলছিলেন। অতঃপর হযরত আম্মার (রাযি.) বলছিলেন, এটি যদি আপনার মর্জির খেলাফ হয়ে থাকে তবে আমি এই হাদীস রিওয়ায়াত করব না।[১]

আখবারে আহাদের প্রসঙ্গকে আমি এজন্য ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘ করছিলাম যে, মুহাদ্দিসীন বিশেষ করে এই মাসআলার কারণেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বহু তর্ক-বিতর্ক করে থাকেন। অথচ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামত খুব সূক্ষ্ম অনুসন্ধান এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এসব সমূহ সতর্কতা ও ইজতিহাদ আখবারে আহাদের সাথে সীমাবদ্ধ, মুতওয়াতির ও মশহুর হাদীসে এর কোনো সম্ভাবনা নেই। এসব কারণেই আখবারে আহাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৮০, হাদীস: ৩৬৮:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّيْ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ، وَكَفَّيْكَ» فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ.

মু'তযিলারা তো আগাগোড়া এসবকে অস্বীকার করে থাকে। তাঁদের পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে কোনো কোনো মুহাদ্দিস তো জোরেশোরে প্রচার করছেন যে, খবরে আহাদকে তো অকাট্য বলে প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। শুধু এতোটুকু শর্তাধীন করা হয়েছে যে, রিওয়ায়াত খুব বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চায় এবং রিওয়ায়াতে যোগ সূত্রহীনতা না থাকা চাই। কোনো কোনো মুহাদ্দিস যদিও বিধি-বিধানের ধারা অনুযায়ী আখবারে আহাদকে ধারণামূলক বলছেন, কিন্তু আদেশাবলির অংশবিশেষে এবং আকায়িদের মাসায়িলে এর প্রতি তদ্রূপ খেয়াল রাখা হয়নি। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ সম্পর্কে যে মতবাদ অবলম্বন করছেন, তা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি যে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল এটি তারই প্রমাণ। মু'তাযিলাদের ন্যায় তিনি আগাগোড়াই এসব অস্বীকার করে বসেননি এবং বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ন্যায় এটিকে অকাট্য বলেও স্বীকার করেননি। এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম এবং ইমান আবু হানিফা (রহ.) একমত।

## খবরে ওয়াহিদ অকাট্য নয়

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), হযরত আয়িশা (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) অনেক ব্যাপারে খবরে ওয়াহিদকে সমর্থন করতে ইতস্তত করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, আখবারে আহাদকে তাঁরা অকাট্য মনে করছেন না। হযরত ফাতেমা বিনতে কাইস (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে রিওয়ায়াত করলেন যে, হযরত ওমর (রাযি.) একজন স্ত্রীলোকের রিওয়ায়াতকে ভিত্তি করেন যা ভুল নাকি সহীহ তাও জানা নেই আল্লাহর কিতাবকে ছেড়ে দিতে পারি না। আখবারে আহাদ দ্বারা কোনো আদেশের ফরয কায়েম করা সম্ভবপর হয় না। কেননা অকাট্য দলীল ব্যতীত ফরয সাব্যস্ত করা যায় না। তবে ওযাজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা যায়। একে ভিত্তি করেই নামাযে কিরাআত হিসেবে সুরা আল-ফাতিহা পড়া ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ফরয বলে সাব্যস্ত করছেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাকে ওয়াজিব বলে রায় দিয়েছেন।

## ইলমে কালামে এর প্রভাব

ফিকহের চেয়ে ইলমে কালামের প্রতি এর প্রভাব অধিক পড়ে এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দীর্ঘকাল এর বিরোধিতা করছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে মাসায়িল ও আকায়িদ



সম্পর্কে ইসলাম একমত তার বিরোধিতায় আখবারে আহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ আম্বিয়ায়ে কেরামের পরহেজগারির প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। এটি আহলে হকদের সর্ববাদীসম্মত মাসআলা। এর বিপরীত যেসব রিওয়ায়াত দ্বারা আম্বিয়াদের পাপ-সংঘটন প্রমাণিত হয় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উসুল অনুযায়ী সেই রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। সেই উসুল অনুযায়ী এমন সব বহু মুশকিল ব্যাপার যা ধর্মভ্রষ্টতার পথে পরিচালিত করে তা হতে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অনেক রিওয়ায়াতকারীই সেসব অতুলনীয় উসুলের মর্যাদা বুঝতে চেষ্টা করেননি। বরং এর বিরোধিতা করতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করেননি।

## ফিকহের বৈশিষ্ট্য

তফসীর ও হাদীস ইত্যাদি যদিও ইসলামের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল, তবুও এসব যে পর্যন্ত একটি বিশেষ বিষয়ে পরিণত না হয়েছিল সেই পর্যন্ত তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামের সাথে বিজড়িত হয়নি। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন সংশোধন ও শৃঙ্খলা-কাজে অগ্রসর হলেন তাঁরা সেই বিষয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই হিসেবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে ফিকহশাস্ত্রের স্থাপতি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষেও তিনি উপাধি-লাভের উপযুক্ত লোক ছিলেন।

এরস্টটল যদি ইলমে মানতিকের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে থাকেন তবে এটা নিঃসন্দেহে যে, আবু হানিফা (রহ.)-এর ইলমে ফিকহের প্রতিষ্ঠাতা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিক্ষাজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো ফিকহ। এজন্য এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। সেই মহান কাজে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ইলমে ফিকহ কখন হতে আরম্ভ হয়েছে সেই সম্পর্কে প্রথমে কিছু বলতে চাই। আর একথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন ফিকহশাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন তখন কি রকম পারিপার্শ্বিকতা ছিল।

## ইলমে ফিকহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) অতিজ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। তা পর্যালোচনা করলেই আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হবে। তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জমানায় শরীয়তের হুকুম-আহকামের

কোনো শ্রেণিবিভাগ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে কিছুই বলতেন না। এটি রুকন, এটি ওয়াজিব, এটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বলতেন না। সাহাবায়ে কেরামও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখে অযু করে নিতেন। নামাযের অবস্থাও তাই ছিল। কোনটি ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি মুস্তাহাব এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম কিছুই জিজ্ঞাসা করতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখতেন, তাঁরাও সেইভাবে নামায পড়েন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কওমের চেয়ে উত্তম কওম আমি আর কাউকেও দেখিনি। কিন্তু তাঁরা হুযুরের জিন্দেগিতে তেরটি মাসআলার চেয়ে অধিক মাসআলা জিজ্ঞাসা করেননি। আর এসবের সবগুলোই কুরআনে মজুদ ছিল। কোনো অসাধারণ ঘটনা যদি ঘটতো তবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ফাতওয়া চেয়ে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)জবাব দিতেন। প্রায়ই এমনই হতো যে সাহাবায়ে কেরাম কোনো কাজ করতেন রাসূলুল্লাহ (সা.) তা পছন্দ বা না-পছন্দ করতেন। সাধারণত জনসভায় এসব মতামত ঘোষণা করা হতো। আর লোকেরা বিশেষ মনোযোগের সাথে তা শুনতেন এবং স্মরণ রাখতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পরে দেশ-জয় অত্যন্ত জোরেসোরে আরম্ভ হয়েছিল। আর বহু দূরদেশে ইসলামি সভ্যতা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। নিত্য-নতুন ঘটনা সংঘটিত হতো। ইজতিহাদ ও সংশোধন আবশ্যকীয় হয়ে ওঠল। তখন সমষ্টিগতভাবে কোনো একটি আদেশের বিস্তৃত বর্ণনা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠল। ধরে নেওয়া হোক, কোনো একজন লোক ভুলে নামাযের কোনো কিছু তরক করে বসল। তখন সমস্যা দাঁড়াল যে, নামায আদায় হলো কিনা। এ রকম সমস্যা দেখা দেওয়ার পর এতে কয়টি ফরয, কয়টি ওয়াজিব ও কয়টি মুস্তাহাব ইত্যাদি নির্ণয় করা সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে জরুরি হয়ে ওঠল।

সেসব সমস্যার সমাধানকল্পে যেসব নিয়ম-পদ্ধতি কায়েম করতে হয়েছিল সেই সম্পর্কে সকলে একমত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। কাজেই মাসআলায় মতবিরোধ দেখা দিল। প্রায় মাসআলাতেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ হতো। এমন ঘটনাও ঘটতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জমানায় এর নাম-নিশানাও ছিল না। তখন সাহাবায়ে কেরামকে যাচাই, নির্বাচন ও কিয়াস ইত্যাদির আশ্রয় না নিয়ে কোনো উপায় ছিল না। সেসব পন্থা কখনও এক জাতীয় ছিল না, কাজেই তাঁদের মধ্যে অবশ্যই মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।



মোটকথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের জমানাতেই আহকাম ও মাসায়িলের এক দফতর স্তুপীকৃত হয়ে ওঠছিল। কাজেই ভিন্নভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিত্য-নতুন ব্যাপারে পরিণত হলো। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা যাচাই ও ইজতিহাদের সাহায্যে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতেন তাঁদেরকে মুজতাহিদ ও ফকীহ বলা হতো। তাঁদের হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এ চারজন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন।

হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) প্রায়ই কুফায় থাকতেন। কাজেই সেখানে মাসায়িল ও আহকামের অধিকতর চর্চা হতো। এভাবে কুফা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। আর হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাযি.) অবস্থিতির দরুন মক্কা-মদীনা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। হযরত আলী (রাযি.) শৈশব হতেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা ও কাজের সাথে তিনি যেরূপ পরিচিত হয়েছিলেন, সেই সৌভাগ্যলাভ অপর কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। একব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, অপরের তুলনায় আপনি রিওয়ায়াত অধিক করবার কারণ কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কেউ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন। আর কোনো কোনো সময় তিনি চুপ থাকলে, আমি নিজেই এর জবাব দিতে থাকতাম।

তাছাড়া হযরত আলী (রাযি.)-এর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁর নির্বাচন ও ইজতিহাদী ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। কাজেই কোনো বিষয় জানতে হলে, লোকেরা হযরত আলী (রাযি.)-এর শরণাপন্ন হতেন। হযরত ওমর (রাযি.) জনসমক্ষে বলতেন, আল্লাহ না করুক যে, কোনো জটিল মাসআলা এসে পড়ে আর হযরত আলী (রাযি.) বর্তমানে না থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নিজেই মুজতাহিদ ছিলেন, অথচ তিনি বলতেন যে, হযরত আলী (রাযি.)-এর ফাতওয়া মিলে গেলে অন্য কিছুর আবশ্যক পড়বে না।

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হাদীস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রেই কামিল ছিলেন। তাঁর ন্যায় অতিকম লোকেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে

প্রকাশ্য ও নির্জনে এবং অহোরাত্র কাল যাপন করার সুযোগ লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বহুকিছু গোপনীয় কথাও তিনি জানতেন। *সহীহ মুসলিমে* হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, 'আমি ইয়ামান হতে এসে মদীনায় অবস্থান করি। আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে এ রকম ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখে তাঁকে নবী পরিবারের লোক বলে মনে করতাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) দাবি করতেন, কুরআন মজীদের এমন কোনো আয়াত নেই, যার শানে নুযুল আমার অবগত নেই। কি সম্পর্কে এবং কখন আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে, আমি সমুদয় অবগত রয়েছি। তিনি আবার বলতেন, কুরআন মজীদ সম্পর্কে আমার চেয়ে কেউ যদি অধিক আলেম থাকতেন তবে আমি তাঁর কাছে সফর করতাম।[১]

*সহীহ মুসলিমে* বর্ণিত আছে যে, তিনি এক সভায় দাবি করলেন, সকল সাহাবায়ে কেরাম অবগত রয়েছেন যে, কুরআন সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বড় আলেম ছিলাম। ইমাম শকীক ইবনে সালামা (রহ.) সেই সভায় ছিলেন। তিনি বললেন, তারপর হতে আমি বহু সভায় উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু কাউকেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর দাবি অস্বীকার করতে শুনিনি।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) যথারীতি কায়দ অনুযায়ী হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা দিতেন। তাঁর মাদরাসায় বহু ছাত্র উপস্থিত থাকত। তাঁদের আসওয়াদ ইবনে হিলাল (রহ.), উবাইদা (রহ.), হারিস (রহ.) ও আলকামা ইবনে কায়স (রহ.) প্রসিদ্ধ ছিলেন।

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯১১, হাদীস: ২৪৬০:

عَنْ أَبِيْ مُوْسَىٰ، قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ، فَكُنَّا حِينًا، «وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ، وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِهِمْ وَلُزُوْمِهِمْ لَهُ».

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯১২, হাদীস: ২৪৬২:

عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١]، ثُمَّ قَالَ: عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُوْنِيْ أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ «قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً، وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنِّيْ أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّيْ لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ» قَالَ شَقِيْقٌ: فَجَلَسْتُ فِيْ حَلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا يَعِيْبُهُ.



ইমাম আলকামা ইবনে কায়স (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.), হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), হযরত আয়িশা (রাযি.), হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.), হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.), হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.), হযরত খাব্বার (রাযি.) এবং আরও বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

বিশেষ করে তিনি প্রায় সবসময়ই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর সাহচর্যে থাকতেন। আর তাঁর রীতিনীতি ও কায়দা-কানুন এমনভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন যে, লোকেরা বলত, কেউ যদি হযরত আলকামা (রহ.)-কে দেখে থাকেন তবে তিনি যেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কেই দেখেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) স্বয়ং বলছেন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে আলকামা (রাযি.) আমার চেয়ে কোনো অংশেই কম নন। এরচেয়ে অধিক জ্ঞান ও সম্মান কি হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম স্বয়ং তাঁর কাছে মাসায়িল জিজ্ঞাসা করতে আসতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এক ইমাম আসওয়াদ ইবনে হিলাল (রহ.) ব্যতীত অপর কেউই হযরত আলকামা (রহ.)-এর সমকক্ষ ছিলেন না।

## ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.)

ইমাম আলকামা ইবনে কায়স (রহ.) ও ইমাম আসওয়াদ ইবনে হিলাল (রহ.)-এর মৃত্যুর পর ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ফিকহশাস্ত্রের বহু অগ্রগতি সাধন করেন। পরিশেষে তিনি ইরাকের ফকীহ উপাধি লাভ করেন। ইলমে হাদীসে তিনি এমন গভীর জ্ঞান লাভ করেন যে, তাঁকে হাদীসের কষ্টিপাথর বলা হতো।

ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) যিনি আল্লামাতুত তাবিয়ীন নামে অভিহিত হতেন, তিনি ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.)-এর মৃত্যুর সময় বলছেন, ইবরাহীম (রহ.) এমন কোনো ব্যক্তিকে রেখে পরলোকগমন করেননি, যিনি তাঁর চেয়ে অধিক আলেম ও ফকীহ হওয়ার দাবি করতে পারেন। একথা শুনে এক ব্যক্তি পরম আশ্চর্যের সাথে বললেন, ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.)ও কি

তাঁর সমকক্ষ নন? ইমাম শা'বী (রহ.) বললেন, শুধু তাঁরা কেন সমগ্র বাসরা, কুফা ও হিজায কোথাও বর্তমানে তাঁর চেয়ে জবরদস্ত আলেম নেই।

ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.)-এর জমানায় ফিকহ-সংক্রান্ত এক ছোটখাট গ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছিল। হাদীসে নববী, হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ফাতওয়া হতে তিনি তা সংকলিত করেছিলেন। এ সংকলন যদিও ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু তাঁর ছাত্র-মহল তা জবানি মুখস্থ করে রেখেছিলেন।

হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক সংকলন ছিল। আর তিনি হযরত ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.)-এর ছাত্র-মহলে সবচেয়ে অধিক নামজাদা ছিলেন। উস্তাদের মৃত্যুর পর হযরত হাম্মাদ (রহ.)ই ফিকহশাস্ত্রের খলীফা পদে সমাসীন হন। হাম্মাদ যদিও ফিকহশাস্ত্রের চরম উন্নতি সাধন করতে পারেননি, কিন্তু তিনি ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.)-এর ফিকহ-সংকলনের বহু বড় হাফিয ছিলেন। হযরত হাম্মাদ (রহ.) হিজরী ১২০ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর পর লোকেরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে ফিকহশাস্ত্রের মসনদে আসন গ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পূর্বে ফিকহ-সংকলন মৌখিক ছিল। আর তাও ততো ধারাবাহিকভাবে ছিল না। তখনও যাচাই ও সংশোধনের নিয়ম প্রচলিত হয়নি। আর আহকামেরও কোনো কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। কিয়াস-শাস্ত্রও ততো উন্নত হয়নি। এটিকে পরিপূর্ণ করে তোলার তখনও বহু কিছু বাকি ছিল। পরবর্তীতে যা ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পূর্ণ করেন।

## ফিকহ-সংকলন ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

তিনি এদিকে কিভাবে ঝুঁকে পড়েন ইতিহাসে এর কোনো সঠিক প্রমাণ নেই। এ সম্পর্কে জনৈক লেখক লিখছেন, দুই ব্যক্তি গোসলখানায় গোসল করতে গিয়েছিল। তারা গোসলখানায় মালিকের কাছে কিছু আমানত রাখে। এক ব্যক্তি গোসল শেষ করে এসে আমানতদারের কাছ হতে আমানত ফেরত চাইল। গোসলখানার মালিক সবকথা খুলে বললে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাজীর ইজলাসে গিয়ে নালিশ দায়ের করল। কাজী সাহেব আসামীকে এই বলে সাব্যস্ত করলেন যে, দুই ব্যক্তি যখন সম্মিলিতভাবে তোমার কাছে আমানত



রাখছিল, এ অবস্থায় উভয়ের উপস্থিতি ব্যতীত শুধু এক ব্যক্তিকে তা ফেরত দিয়ে দেওয়া নিতান্ত অনুচিত হয়েছে।

আসামী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শরণাপন্ন হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তা শোনামাত্র তাকে বলে দিলেন, তুমি গিয়ে ফরিয়াদিকে বলে দাও যে, তুমি একাকী আসছ না কেন? তুমি তোমার সাথীকে নিয়ে এসে তোমাদের আমানত ফেরত নিয়ে যাও। কথিত আছে যে, এ ঘটনার পর হতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহশাস্ত্রেও প্রভূত কল্যাণ সাধনে লেগে গেলেন। তখন হতে তা ধারাবাহিকভাবে করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চলতে থাকে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উস্তাদ, হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি বিশেষ কর্তব্যপরায়ণ হন। তখন মুসলিম-সাম্রাজ্য ও সভ্যতা-সীমা অসাধারণভাবে বেড়েই চলছিল। ইবাদত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন ইত্যাদি ব্যাপারে নিত্য-নতুন ঘটনা-ঘটত। নির্দিষ্ট, পরিকল্পিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান ব্যতীত দেশকে সুপরিচালিত করা অসম্ভব ব্যাপার। রাজ্য-বিস্তৃতি ও অপর সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্রবের দরুন শিক্ষা-দান ও শিক্ষা-প্রাপ্তি সমধিক পরিপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। জবানি সনদ ও রিওয়ায়াত কিছুতেই সেই প্রয়োজন মিটাতে পারে না।

এসব পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে এমনই একভাব জন্মিয়ে দিলেন যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের যাবতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে যা কিছু নির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক নিয়ম-কানুনের অপরিহার্য প্রয়োজন তা নির্ধারণে সুধীমণ্ডলী এমনকি জনসাধারণের মধ্যেও একটি প্রেরণা জেগে উঠল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রকৃতি ছিল মুজতাহিদ-সুলভ। আর তিনি ছিলেন অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শী, তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও অপর রাজ্যের সাথে সংশ্রব সেই প্রয়োজনকে অধিকতর প্রকট করে তোলে।

## ফিকহ-যাচাই ও ছাত্র-সহায়তা

যে রিওয়ায়াত-যাচাই কাজে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অগ্রসর হয়েছিলেন তা মামুলি ব্যাপারে ছিল না। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর সেই বিরাট সঙ্কল্প সাধনে অপরাপর বহুলোকের সাহায্য ও সহানুভূতির বিপুল প্রয়োজন। এ কাজে চরম উন্নতি সাধন করতে হলে তিনি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ও অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন

মনে করলেন না। কাজেই তাঁর ছাত্র-মহল হতে বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে একটি দল গঠন করলেন।

ভিন্নভিন্ন বিষয়ে তিনি ভিন্ন ছাত্রের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন। যার যে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিমত্তা অধিক ছিল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁকে সেই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়েদা (রহ.), ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস (রহ.), কাজী আবু দাউদ আত-তায়ী (রহ.), ইমাম হিব্বান ইবনে আলী (রহ.) ও ইমাম মানদাল ইবনে আলী (রহ.) হাদীসে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইমাম যুফার (রহ.) যাচাই ও নির্বাচন ব্যাপারে বিচক্ষণ ছিলেন। সাহিত্যে বিখ্যাত ছিলেন কাসিম ইবনে মা'ন (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁদের সকলকে নিয়ে একটি মূল কমিটি কায়েম করলেন। আর তিনি ছিলেন সেই কমিটি পরিচালনের সর্বময় কর্তা। যথানিয়মে ফিকহশাস্ত্রের যথাসম্ভব দ্রুত উন্নতির প্রচেষ্টা চলল। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাওয়ী (রহ.) ইমাম আসাদ ইবনুল ফুরাত (রহ.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে কতিপয় ছাত্রকে ফিকহশাস্ত্রের চরম উন্নতির জন্য নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম যুফার (রহ.), ইমাম দাউদ আত-তায়ী (রহ.), আসাদ ইবনে ওমর (রহ.), ইউসুফ ইবনে খালেদ (রহ.) ও ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়েদা (রহ.) বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম তাহাওয়ী (রহ.) এও রিওয়ায়াত করেছেন যে, সবকিছু লিপিবদ্ধ করার ভার পড়েছিল ইমাম ইয়াহইয়া (রহ.)-এর ওপর। আর দীর্ঘ ত্রিশ বছরকাল তিনি সেই কাজে ব্রতী ছিলেন।

## যাঁচাই-কষ্টিপাথর

কোনো এক মাসআলা মীমাংসা করতে হলে তা ছাত্রদের মজলিসে পেশ করা হতো। আর প্রত্যেকেই পরম ও চরম স্বাধীনতার সাথে স্বীয় মতামত পেশ করতেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাগরের ন্যায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদারভাবে সবকিছু শুনে যেতেন। একটি বিষয়ে সকলে একমত হলে তা অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা হতো। কখনও কখনও সেই তর্ক-সভা দীর্ঘকাল অবধি চলতে থাকত। এমনও হতো যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রায় প্রকাশ হওয়ার পরও ছাত্রবৃন্দ নিজ নিজ রায় মুতাবেক চলতেন।



## ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ (রহ.)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র মহলে যখন কোনো একটি বিষয় প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলত তখন ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) উপস্থিত না থাকলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলতেন, আফিয়াকে আসতে দাও। তিনি আসলে আবার তর্ক সভা চলত। তখন সকলে একমত হলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এভাবে দীর্ঘ ত্রিশ বছর সাধনার ফিকহশাস্ত্র উন্নতির স্বর্ণশিখরে উপনীত হলো। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শেষ-জীবন কারাগারে কাটে। কারারুদ্ধ জীবনেও সেই সাধনা অব্যাহত থাকে।

## সভার সাধারণ নিয়ম

পবিত্রতা, নামায, রোযা, ইবাদতপন্থা, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভাগ-বাটোয়ারা ইত্যাদি ধারা অনুযায়ী সভার কাজ চলত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবদ্দশাতেই তিনি উক্ত মজলিসের সফলতা স্বচক্ষে দেখতে সমর্থ হন। যেকোনো দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হলে কিয়াস দ্বারা এর স্বাচ্ছন্দে সমাধান হয়ে যেত। কোনো একটি বিষয়ের চরম মীমাংসা হয়ে গেলে রাজ্যময় তা প্রচার করে দেওয়া হতো।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিক্ষা-মজলিস একটি নিয়ম-নিষ্ঠার মাদরাসা ছিল তাঁর অসংখ্য ছাত্র সরকারের উচ্চ ও নিম্ন পদে চাকরি করতেন, তাঁদেরকে ডিঙিয়ে রাজ্য শাসন করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। একটি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যেসব লোক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরোধিতা করতেন তাঁরাও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিতাব পড়তেন। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) তাঁরা বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কিতাব লিখতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিতাব হতে বহু সাহায্য নিয়েছেন।

এক বুযুর্গ বলেন, একদিন ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-এর বালিশের নীচে আমি একটি কিতাব দেখতে পেলাম। তিনি মাঝে-মাঝে তা পাঠ করতেন। আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে কিতাবখানা খুলে দেখলাম যে, তা রিহন বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি কিতাব। আমি পরম আশ্চর্যের সাথে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিতাব পড়ে থাকেন? জবাবে তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, তাঁর সবকিছু

কিতাব যদি আমার হাতে পড়ত! এটিও কম আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাঁর জমানায় বহু বড় ইমাম ও আলেম ছিলেন। আর অনেকে তাঁর বিরোধিতাও করছেন। কিন্তু তাঁর কিতাবকে রদ করার সাহস কেউ পান না।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) মুনাকিবুল ইমাম আশ-শাফিয়ী কিতাবে লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ যে সময় মাসায়িল জারি করেছেন তখন দুনিয়া মুহাদ্দিস ও রিওয়ায়াতকারীদের দ্বারা ভরপুর ছিল। তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কথা, কাজ ও কিতাবের প্রতিবাদ করতে কারও সাহসে হত না। ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহ.) লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বার লক্ষ নব্বই হাজারের চেয়ে অধিক মাসায়িল লিপিবদ্ধ করেছেন।

## অধিকাংশ শাসনকর্তাই হানাফী ছিলেন

এটি বিশেষ লক্ষ করার বিষয় যে, রাজমুকুট যাঁদের শিরোপরি শোভা পেত তাঁদের প্রায় সকলেই হানাফী ফিকহ-ভক্ত ছিলেন, তবে আব্বাসী বংশধর এর বরখেলাফ ছিলেন। তাঁরা যতোদিন পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেছেন ততোদিন পর্যন্ত তলোয়ার ও কলম তাঁদের করায়ত্ত রেখেছেন। অর্থাৎ ইজতিহাদও তাঁদের দাবি ছিল। আর তারা কোনো দিন কারও তকলীদ। (অনুকরণ ও অনুসরণ) করেননি। তাঁদের পতনের পর তাঁদের এমনই অধঃপতন হয়েছিল যে, জনগণের ওপর তাঁদের কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না, সেই প্রশ্নও অবান্তর ছিল না।

তবে এতটুকু বলা চলে যে, তাঁরা যদি কারও তকলীদ করে থাকেন তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এরই তকলীদ করেছিলেন। আব্বাসী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক হানাফী ছিলেন। আব্বাসীদের পরে যাঁরা শাসনদণ্ডের অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই হানাফী ছিলেন। যে সালজুকরা দীর্ঘকাল অবধি রাজত্ব করেছিলেন এবং যাঁদের শাসনকালে মুসলিম রাজত্ব দৈর্ঘ্য কাশগড় হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং প্রস্থে কনস্টান্টিনোপল হতে ঘরজ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে তাঁরাও হানাফী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। যে সুলতান মাহমুদ গযনবী (রহ.) ভারতবর্ষের প্রতিটি লোকের কাছে পরিচিত, তিনিও হানাফী ফিকহের জবরদস্ত আলেম ছিলেন।

ফিকহ সম্পর্কে তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এতে প্রায় ষাট হাজার মাসআলা ছিল। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.)-এর নাম



কারও কাছে অপরিচিত নয়। তিনিও হানাফী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ী সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) তাঁর দরবারেরই একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনিই দুনিয়ার সর্বপ্রথম দারুল হাদীস কায়েম করেন। যদিও তিনি শাফিয়ী ও মালিকী ফিকহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তবুও তিনিও তাঁর বংশধররা হানাফী মাযহাবভুক্ত ছিলেন।

অবশ্য সুলতান সালাহউদ্দীন (রহ.) শাফিয়ী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশধরদের মধ্যে হানাফী মাযহাব প্রচলিত ছিল। ঈসা ইবনুল মালিকুল আদেল একজন শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী ও সচেতন শাসক ছিলেন। তিনি পরম দয়ালু ও মহা পরাক্রমশালী বাদশাহ ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের পরম ভক্তবৃন্দ ছিলেন।[১]

তুরস্ককের শাসকবৃন্দ প্রায় ছয়শত বছর পর্যন্ত রুম যাঁদের করতলগত ছিলেন এবং আজও ইসলামের ইজ্জত ও গৌরব রক্ষার্থে বিশ্ববাসী যাদের মুখপানে তাকিয়ে রয়েছে তাঁদের প্রায় সকলই হানাফী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের শাসনকর্তারা এবং তৈমুরের বংশধররাও হানাফী মাযহাবভুক্ত। আর তাঁদের দীর্ঘ রাজত্বকালে হানাফী বংশধররাও হানাফী মাযহাবভুক্ত। আর তাঁদের দীর্ঘ রাজত্বকালে হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাব এখানে প্রবেশ পায়নি।

## হানাফী মাযহাবের জনপ্রিয়তা

অনেকের ধারণা হচ্ছে, সরকারি সাহায্যই হানাফী মাযহাবের জনপ্রিয়তার একমাত্র উৎস ছিল। বিখ্যাত ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, দুইটি মাযহাবই প্রথম হতে সরকারি সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, হানাফী মাযহাব। ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) যখন প্রধান কাজী-পদে ব্রতী হন তখন তিনি বহু হানাফী লোককে উচ্চ চাকরিতে নিযুক্ত করেন।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর মাযহাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর শাগরেদ ইয়াহইয়া খলীফার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র

---

[১] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৭, পৃ. ১৪১

ছিলেন। তাঁর পরামর্শ ব্যতীত খলীফা কাউকেও কাজী-পদে নিযুক্ত করতেন না। তিনিও শুধু তাঁর মাযহাবভুক্ত লোককে উক্ত পদে নিযুক্ত করতেন। এসব গেল ইমাম ইবনে হাযম (রহ.)-এর বাহ্যিক দৃষ্টির কথা।

হিজরী ১২০ সালে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মসনদে ইজতিহাদে সমাসীন হন। ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) হিজরী ১৭০ সালে প্রধান কাজী-পদে নিযুক্ত হন। খলীফা হারুনুর রশীদের জমানায় ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর ওয়ায-নসীহত ও যশ-গৌরব ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। খলীফা হারুনর রশীদ হিজরী ১৩০ সালে সিংহাসনে সমাসীন হন। ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর প্রভাব ব্যতীতই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আলোকে দুনিয়াকে আলোকিত করেছিল।

তাঁর মাযহাব জনসাধারণের কাছে অতিপ্রিয় ছিল। তাঁর অসংখ্য ছাত্র উচ্চ রাজপদে সমাসীন হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর সফলতা লাভের জন্য অপর কারও সাহায্য নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কল্যাণে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসায়িল সমধিক প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু হানাফী মাযহাবের প্রচার মূলত ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর চেষ্টা ও কর্মধারার ওপর নির্ভরশীল ছিল না।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরোধী মহলের লোক হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে, হানাফী মাযহাব খুব শক্তিশালী। আর এটি সুপ্রসিদ্ধিও লাভ করেছেন প্রচুর। মানুষের অন্তরদেশে এটি স্থান পেয়েছে। তাছাড়া ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)-এর যখন খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে পদোন্নতি হলে তখন হানাফী মাযহাবের শক্তি অধিক বৃদ্ধি পায়।

ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর প্রভাব খলীফা হারুনুর রশীদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি চিরস্মরণীয় রইল কেন? বহু ইমামই তাঁদের জমানায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) তাঁর জীবদ্দশায় এমনকি তারপরও সমগ্র শামদেশে অদ্বিতীয় ইমাম হিসেবে সম্মান লাভ করেন।

তবুও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সীমাবদ্ধ ছিল, কালের পরিক্রমায় তাঁর নাম-নিশানা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কাজেই এসব দ্বারা সুপ্রমাণিত হয় যে,



ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব এমন কোনো অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য ছিল, যা অন্য কোনো মাযহাবে ছিল না।

## অন্যান্য ইমামদের প্রসার লাভের ভিত্তিভূমি

সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ফিকহ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁদের প্রত্যেকের ফিকহশাস্ত্রের নিজস্ব গুণাগুণ এবং মৌলিকতা এসবের গুরুত্ব পরিবর্ধনে অবশ্যই বিপুলভাবে সহায়ক ছিল। তাছাড়া বাইরের পারিপার্শ্বিকতাও এসবকে কম প্রভাবান্বিত করেননি। আমার মতে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিকতাই তাঁদের প্রসিদ্ধি লাভে বিপুল সাহায্য করেছিল।

ইমাম মালিক (রহ.) মদীনাবাসী ছিলেন। এটি নুবুওয়াতের প্রাণকেন্দ্র ছিল। খুলাফায়ে রাশিদীনের জমানায়ও এটি রাজধানী ছিল। কাজেই সাধারণত জনসাধারণ মদীনার ইমামের প্রতি বিশেষ আন্তরিকতা ও বিশ্বাস-ভক্তি রাখত। তাঁর বংশধরও একটি ইলমী খান্দান ছিল।

তাঁর দাদা মালিক ইবনে আবু আমার (রহ.) প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরামের কাছ হতে হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর চাচা শায়খুল হাদীস ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) যখন হাদীস ও ফিকহে বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন, তখন তাঁর পারিপাশ্বির্কতকা তাঁর প্রভাব বিস্তারে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল। তখন চারদিকে তাঁর যশ ও গৌরব বিস্তৃতি লাভ করে।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর পারিপার্শ্বিকতা তাঁর প্রসিদ্ধি বিস্তারে অধিকতর সাহায্য করেছিল। মক্কা-শরীফ ছিল তাঁর জন্মস্থান। তিনি কুরাইশ বংশের মুত্তলিবের বংশধর। মাতৃ-পক্ষের দিক দিয়ে তিনি হাশিমী ছিলেন। তাঁর সমগ্র গোষ্ঠী বীরশ্রেষ্ঠ ও চিরসম্মানী ছিলেন। তাঁর দাদার পিতা বদরের যুদ্ধে হাশিমীদের পতাকাবাহী ছিলেন। তিনি মক্কাতেই জন্মগ্রহণ করেন। একটি লোককে প্রসিদ্ধ করে তুলতে এর চেয়ে উত্তম পারিপার্শ্বিকতা আর কি থাকতে পারে?

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এসব অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা ছিল না। কুরাইশী বা হাশিমী হওয়া দূরের কথা, তিনি আরব দেশের অধিবাসী পর্যন্ত ছিলেন না। মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় হওয়ার মতো উপযুক্ত লোক তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। ব্যবসা ছিল তাঁর বাপ-দাদার পেশা। তিনিও

জীবনের এক বিরাট অংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে কাটান। তাঁর জন্মভূমি কুফা নগর যদিও শিক্ষা-কেন্দ্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, কিন্তু মক্কা মদীনার সাথে এর কোনো তুলনা হতে পারে না।

এসব কারণ অপ্রিয় পারিপার্শ্বিকতার দরূণ বহু মুহাদ্দিস ও রিওয়ায়াতকারী তাঁর ঘোর বিরোধী ছিলেন। সংক্ষেপে এতোটুকু বলা চলে যে, অতিঅনায়াসে জনগণ কর্তৃক সমাদৃত এবং জনগণকে প্রভাবান্বিত করার জন্য যা কিছু পরিবেষ্টনে আবশ্যক, সেসবের কোনো কিছুই তাঁর অনুকূলে ছিল না। এ অবস্থায় তাঁর ফিকহশাস্ত্র যে, একদিন সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্যে প্রচারিত ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল এর মূলে নিশ্চয়ই কোনো অন্তর্নিহিত শক্তি বিরাজ করে থাকবে। মানব-মনের দেহ-মনের খোরাক নিশ্চয়ই এতে ছিল।

বিশ্ব সভ্যতার সাথে তাঁর ফিকহশাস্ত্রের যেভাবে গভীর যোগাযোগ ছিল অপর কোনো ইমামের বেলায় তা প্রজোয্য নয়। এজন্যই যেসব শহরে সভ্যতা অধিক বিস্তৃতি লাভ করেনি সেসব শহরে অন্যান্য ইমামের ফিকহ অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইমাম ইবনে খালদুন (রহ.) বলছেন যে, এই কারণেই ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব পূর্বদেশে ও আন্দালুসে অধিকতর প্রসার লাভ করেছিল। সেখানকার লোকেরা ততো উন্নতি লাভ করেনি। এই কারণেই সেখানে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাব ততো প্রসার লাভ করেনি।[১]

হানাফী ফিকহে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ব্যতীত তার অপরাপর নামজাদা ছাত্রদের মাসায়িলও শামিল ছিল। তা সেই জমানার জন্য অতিমহান আইন, বরং অমূল্য বিধি-বিধানের সমষ্টি ছিল। তারপরও যখন হানাফী ওলামায়ে কেরাম সেই সঙ্গে বহু কিছু যোগ করেন এবং শত দিক দিয়ে এর অধিক উন্নতি লাভ হয়েছিল আর প্রাথমিক অবস্থায় হানাফী ফিকহ যতোদূর পর্যন্ত উন্নতি লাভ করেছিলেন, তখন এর চেয়ে অধিক উন্নতি কিছুতেই আশা করা যেত না। সেই বিরাট গ্রন্থে ইবাদত ব্যতীত দেওয়ানি, ফৌজদারি, সাক্ষ্যপ্রদান, উত্তরাধিকার, অসিয়ত ইত্যাদি বহু কিছু আইন-কানুন স্থান লাভ করেছিল।

বিশ্ববিখ্যাত খলীফা হারুনুর রশীদের বিশাল রাজত্ব তখন ভারতবর্ষ হতে এশিয়া ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সেই বিশাল রাজত্বও চলত হানাফী

[১] ইবনে খালদুন, *তারীখু ইবনি খালদুন*, খ. ১, পৃ. ৫৬৯



আইন অনুযায়ী। তাঁর সময়কার সবকিছু ঘটনা সমস্যার সমাধান হতে এ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী। কাজেই হানাফী মাযহাবের গুরুত্ব কতখানি সুগভীর তা সহজেই অনুমেয়।

## ফিকহ-সংক্রান্ত মাসায়িলের তফসীর

ফিকহ মাসায়িল দু'ভাগে বিভক্ত। এ হিসেবে এটিকে দুইটি ভাগ করা হয়েছে,

১. শরীয়ত হতে যে মাসায়িল নেওয়া হয়েছে তাকে শরীয়তী আহকাম বলা যায়।
২. যেসব আদেশ সম্পর্কে শরীয়ত চুপ, সভ্যতা এবং জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনের তাগিদে এর ভিত্তি-পত্তন হয়েছে, শরীয়তে অবশ্য এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তা শরীয়তের প্রবাহধারা নয়।

প্রথম শ্রেণির মাসআলা অনুযায়ী ফকীহকে শারিহ ও মুফাসসির নামে অভিহিত করা যায়। সেই যোগ্যতা লাভের জন্য তাঁদের মুবারক জবান কুরআন-অভিজ্ঞ, নির্বাচন ক্ষমতাশীল প্রতিভা ও বহু জিনিসের সংমিশ্রণ-সমাধান ক্ষমতা থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির আহকাম অনুযায়ী স্পষ্ট ফিকহ ও আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা থাকা চায়। দুনিয়ার অন্যান্য বিখ্যাত আইন প্রণয়নকারীদের ন্যায় ফিকহবিদ ব্যক্তিরও তেমন উপযুক্ততা থাকা চায়। মুসলিম জাহানে এমন সব বহুলোক অতীত হয়ে গেছেন যাঁরা কুরআন ও হাদীসের সুবিখ্যাত ও সুযোগ্য মুফাসসির ও শারিহ ছিলেন। কিন্তু অতিকম লোকেরই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছিল।

এ রকম ব্যক্তিত্বও বহু জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁর আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু তাঁদেরকে কুরআন ও শরীয়তের মুফাসসির বলা চলে না। আমি যতোটুকু অবগত আছি তাতে আমার মনে হয়, মুসলিম জাহানের সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ উভয়বিধ জ্ঞানই আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে দান করেছিলেন, যার সমন্বয় আপন কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের মধ্যে পাওয়া যায়নি। ইলমে ফিকহে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে, তিনি তাশরীয়ী ও গায়রে তাশরীয়ী আদেশের মধ্যে ভেদরেখা টেনে দিয়েছেন।

## মাযহাবী ও অ-মাযহাবী হাদীসাবলির পার্থক্য

শরীয়ত বর্ণানাকারীদের কথা ও কাজ যা রিওয়ায়াত হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে এসবের মধ্যে এমন কিছু আদেশও রয়েছে মাযহাবের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাধারণভাবে এসবকে হাদীসের কথা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ফিকহ বিস্তৃত বিবরণে একটি সাধারণ ও মহাভুল এই হয়েছে যে, এসবকে শরীয়তের অন্তর্গত বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে এসবের ওপর নির্ভর করে মাসায়িল ও আহকাম কায়েম করা হয়েছে। অথচ এসব হাদীস শরীয়তের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না।

ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যা কিছু ইরশাদ করেছেন এবং হাদীসের কিতাবসমূহে তা স্থান পেয়েছে তা দুই প্রকারে। যথা–

১. তবলীগে রিসালাতের সাথে যেসব সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

‘রাসূলুল্লাহ যা প্রদান করেছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।’[১]

২. যা তবলীগে রিসালাতের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ».

‘আমি একজন মানুষমাত্র। আমি যখন কোনো ধর্মীয় আদেশ করি তখন তা তোমরা পালন করবে। আর যখন নিজের রায় অনুযায়ী কোনো আদেশ করি তখন আমি একজন মানুষ মাত্র।’[২]

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-হাশর*, ৫৯:৭

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৩৫, হাদীস: ২৩৬২, হযরত রাফি’ ইবনে খাদীজ (রাযি.) থেকে বর্ণিত



সেসব কাজ হাদীসের দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। এসব বর্ণনা ইবাদত হিসেবে, না ঘটনাক্রমে, না ইচ্ছাপূর্বক ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ সম্প্রদায়ের ধারণা অনুযায়ী যা বর্ণনা করছেন, এসব হাদীস এর অন্তর্গত। হযরত উম্মে যার’র হাদীস ও খরাফার হাদীস এবং সেসব কাজ এর অন্তর্গত যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আংশিক মঙ্গলের খাতিরে গ্রহণ করতে বলছিলেন। তা সকলের জন্য আমল করা ওয়াজিব ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সৈন্যদের প্রস্তুতির উল্লেখ করা যায়। এ ভিত্তিতে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বলছেন,

مَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ كُنَّا نَتَرَاءَىٰ بِهِ قَوْمًا قَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ.

‘এখন রমল (এমন এক বিদ্যা যার সাহায্যে গায়েবের কথা বলা যায়) করার কোনো আবশ্যক নেই। যাদেরকে দেখানোর মানসে আমরা রমল করতাম আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।’

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বহু আদেশ উক্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আদেশ করেছিলেন,

«مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ».

‘জিহাদে কোনো ব্যক্তি যদি কাফিরকে হত্য করে তবে সেই ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির তলোয়ায়ের মালিক হবে।’[১২]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) হাদীসের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে যে সূক্ষ্ম প্রভেদের কথা বর্ণনা করেছেন সেসবরে প্রতি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল। জুমুআর দিবসে গোসল, দুই ঈদের দিনে স্ত্রীলোকদের বের হওয়া, তালাকের আদেশ জারি হওয়া, জিজয়া নির্ণয় ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেসবকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এসব হাদীসকে তশরীয়ী হাদীস বলে বিবেচনা করেছেন।

হানাফী ফিকহ এসব নিয়ম কানুনের অধীন। আর এতে ব্যক্তি স্বাধীনতাও রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ইমামের মাসআলায় তা পাওয়া যায়নি।

[১] ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*খ. ৬, পৃ. ৪৭৮, হাদীস: ৩৩০৮৪, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, *হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা*, খ. ১, পৃ. ২২৩–২২৪

হানাফী ফিকহ অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, অন্যান্য ইমামগণ এসবের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেননি। খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে যদি এসব দৃষ্টান্ত না থাকত তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও বোধ হয় এ কাজে অগ্রসর হতেন না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরও যদি কোনো কোনো ইমাম তাঁর বিরোধিতা করে থাকেন এবং তাঁর উসুলের পায়রবি না করে থাকেন আর সেসব ভ্রম ধারণার ওপরই কায়েম থেকে থাকেন, তবুও এতে বিন্দুপরিমাণও সন্দেহ নেই যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রায় অত্যন্ত সহীহ এবং তাঁর ফিকহও সহীহ ভিত্তির ওপর স্থাপিতা রয়েছে।

## যে মাসআলা তশরীয়ী নয়

খুলাফায়ে রাশিদীনের চেয়ে শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি কার থাকতে পারে? তাঁদের কার্যকলাপ আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মাতো তাকে বেচাকেনা করা হতো। হযরত ওমর (রাযি.) সেই প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন গনীমতের মাল বণ্টন করতেন তখন স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের জন্য অংশ রেখে দিতেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে অপরের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং হযরত আলী (রাযি.)ও হাশিমীদেরকে এর কোনো অংশ দেননি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জমানায় এমনকি হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খিলাফতের সময়ও তিন তালাককে এক তালাক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। হযরত ওমর (রাযি.) স্বীয় খিলাফতের সময় ঘোষণা করে দিলেন যে, তিন তালাককে বায়িন তালাক বিবেচনা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জমানায় শরাব পানের কোনো নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। হযরত আবু বকর (রাযি.) চল্লিশ দুররা এর শাস্তি হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেন। এতেও শরাব পান কমছে না দেখতে পেয়ে হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর খিলাফতের জমানায় চল্লিশ দুররার পরিবর্তে আশি দুররা নির্দিষ্ট করে দেন। এসব ঘটনা হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসবের প্রামাণ্য কেউই অস্বীকার থাকতে পারে যে, সেসব হুকুমকে তাঁরা তশরীয়ী আদেশ মনে করা সত্ত্বেও সেসবের খেলাফ কাজ করতেন? নাউযু বিল্লাহ, তাঁরা যদি তাই করতেন, তবে তাঁরা খুলাফায়ে রাশিদীন হওয়ার



উপযুক্ত হতেন না। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির থাকতেন এবং তাঁর সাহচর্য হতে ফয়েয লাভ করতেন। তাঁদের পক্ষে এটা জানা সহজ ব্যাপার ছিল যে, কোন কোন আদেশ তশরীয়ী শ্রেণিভুক্ত।

হযরত আয়িশা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর কোনো এক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, 'আজ যদি আল্লাহর রাসূল (সা.) বর্তমান থাকতেন তবে তিনি স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিতেন না।' এতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ছে যে, হযরত আয়িশা (রাযি.) আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সেই আদেশকে তশরীয়ী বলে বিবেচনা করতেন না এবং এটিকে অপরিহার্য বলেও বিবেচনা করতেন না। অন্যথায় সময় ও অবস্থার ওপর কি প্রভাব খাটাতে পারে?

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরামেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। সবকিছুর ব্যাপারে তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনেরই অনুকরণ-অনুসরণ করতেন। তালাকের মাসআলা সম্পর্কে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর অভিমত প্রসঙ্গক্রমে জনৈক কাজী সাহেব লিখেছেন, আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর মোকাবেলায় বেচারা ওমর (রাযি.)-এর কি হাকীকত থাকতে পারে? কিন্তু সেই কাজী সাহেবের জানা উচিত ছিল যে, তাঁর চেয়ে হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) অধিক অবগত ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তুলনায় তাঁর কোনো হাকীকতই থাকতে পারে না।

ফিকহের পূর্বে শপথ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এক কষ্টি-পাথর দানপূর্বক সমাজের বিরাট মঙ্গল সাধন করেছেন। এর দরুনই ফিকহ, যা তখন পর্যন্ত মাসআলার কোনো এক অংশবিশেষ হিসেবে বিবেচিত হতো তা কালক্রমে একদিন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়। তাঁর সর্বাপেক্ষা বাহাদুরি হচ্ছে, জ্ঞান-চর্চা যখন অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, এমনকি নকল করা বা গ্রন্থ মুদ্রিত করার প্রথাও চালু ছিল না, তখন এমন একটি অতিসূক্ষ্ম বিষয়ে ভিত্তি গড়ে তোলা তা প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এরই কাজ ছিল।

অনেকের ধারণা হচ্ছে, এসব নিয়ম-কানুন যা আজকাল ফিকহ নামে পরিচিত, তা সকলের পূর্বে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এর ভিত্তি পত্তন করেন। একদিক দিয়ে এই দাবি সত্য যে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর পূর্বে তা কখনও লিখিতভাবে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বহু পূর্বেই এর

মূলভিত্তির পত্তন হয়েছিল। এ হিসেবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কেই ফিকহশাস্ত্রের ভিত্তি পত্তনকারী বলা চলে।

## মাসআলা যাচাই কখন শুরু হয়?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাসআলা-যাচাই ও রিওয়ায়াত-নির্বাচন তাবিয়ীন এমনকি সাহাবায়ে কেরামের যুগেই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তা তখন কোনো ধারাবাহিক ইলমী নিয়ম-পদ্ধতির অধীন ছিল না। সাধারণ লোক কোনো কিছু শোনে যেমন কোনো উপসংহারে বা নিজ নিজ প্রেরণা ও বুদ্ধি অনুযায়ী যেমন ইচ্ছে তার তাৎপর্য গ্রহণ করে, অথচ জানেও না যে, তা কোনো সাধারণ নিয়ম-তন্ত্রের অধীন কিনা এবং এর শর্তাবলি ও কায়দা-কানুন তারা কিছুই অবগত নয়, তদ্রূপভাবেই তাঁরাও ফিকহ-সংক্রান্ত মাসায়িল যাচাই ও নির্বাচন করতেন। তখন কোনো ইলমী পরিভাষাও কায়েম হয়নি, কোনো ধারাবাহিক উসুলও তখন ছিল না।

## ওসায়িল ইবনে আতা ও ফিকহের কিছু কায়দা

বনি উমাইয়ার রাজত্বকালের শেষ ভাগে কিছুকিছু ইলমী পরিভাষার সমাবেশ হয়েছিল। ইলমে কালামের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা শরীয়তের আদেশাবলির সর্বপ্রথম শ্রেণি বিভাগ করেন। সত্য-উদ্ধারে তিনি কুরআনের নাতিক, হাদীসে মুত্তাফাক আলাইহি, ইজমায়ে উম্মত ও বুদ্ধিগত প্রমাণ এ চারটি পন্থা বের করলেন। বুদ্ধিগত প্রমাণ অর্থ কিয়াস।

এছাড়া তিনি আরও কতিপয় মাসআলা ও পরিভাষা কায়েম করেন তা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও বিশিষ্ট লোকের বোঝাপড়ায় বহু পার্থক্য রয়েছে। শুধু সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে হতে পারে। এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে একথা বলা চলে যে, তখন হতে উসুলে ফিকহের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই প্রারম্ভের ওপর ততোটুকু গুরুত্ব দেওয়া চলে, যতোটুকু গুরুত্ব প্রদান করা চলে যে, হযরত আলী (রাযি.) নাহবের দুই তিনটি নিয়ম বর্ণনা করেন। অথচ সেই হিসবে তাঁকে নাহবশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পূর্বে এ সম্পর্কে যা কিছু হয়েছিল তা এরচেয়ে অধিক ছিল না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহশাস্ত্রকে মুজতাহিদসুলভ এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু হিসেবে একটি ধারাবাহিক রূপ



দিতে চেয়েছিলেন। কাজেই তাঁর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার বাসনায় মাসআলা যাচাই এবং মাসআলা বের করার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন।

## উসুলে ফিকহের ভিত্তিভূমি

পরবর্তী সময়ে উসুলে ফিকহ যদিও একটি বিরাট বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং এভাবে অসংখ্য মাসায়িলের ভিত্তি পত্তন হয়েছিল, অথচ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানায় এটি কোনো বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত হতো না, কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এর মূল বীজ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানাতেই বপন করা হয়েছিল।

হাদীস-শৃঙ্খলা ও তার যাবতীয় আদেশ, সংশোধন ও সুনিয়ন্ত্রণ, উসুলসমূহের সামঞ্জস্য স্থাপন, কিয়াসের আহকাম ও শর্তাবলি, হুকুমের শ্রেণি-বিভাগ, সাধারণ ও অসাধারণের পার্থক্য, বিভিন্ন মতবিরোধের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি উসুলে ফিকহের যেসব মূলবস্তু রয়েছে সেসব সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) জরুরি উসুল ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করে গেছেন।

হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উসুল প্রণয়ন করছেন তা হাদীসের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তিনি বহু বিধি-বিধান দান করে গেছেন। তিনি এ সম্পর্কে যা কিছু বিধান দিয়েছেন তা লিপিবদ্ধ করতে গেলে এর বিরাট গ্রন্থে পরিণত হবে। এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তা সম্ভবপর নয়। শাফিয়ী ও হানাফী বহু কিতাবে এসবের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এসবের প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইজতিহাদের একটি বিশিষ্ট পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন।

এসবের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করলে আরও বোঝা যায় যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর তরীকা এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তরীকায় কোনো পার্থক্য নেই। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দান হিসেবে তিনি একজন মুফাসসির ও সংকলনকারী। আর একথা নিঃসন্দেহে, এই প্রসঙ্গে তাঁর যে অবদান রয়েছে তা শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়, বরং সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাসে অতুলনীয়।

আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত আরও বহু জাতি রয়েছে। আর তাঁরা সেসব কিতাব হতে বহু কিছু আদেশ উপদেশ গ্রহণ করেও থাকেন। কিন্তু তাঁদের

কেউই একথা দাবি করতে পারবেন না যে, তাঁরা সেসব সমস্যা সমাধানে কোনো ধারাবাহিক বিধি-বিধান অনুযায়ী এবং যথাযথ যুক্তিসংগতভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন করে তা একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত করে গেছেন।

## হানাফী ফিকহ ও রাজ্য পরিচালনা

এর যে অংশটুকু আইন-কানুনের সাথে বিজড়িত তা এর অপরাপর অংশ হতে শতগুণে বিস্তৃত ও প্রশস্ত। আর এ দিক দিয়েই অপরাপর মুজতাহিদীনের তুলনায় তাঁর একটি অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বরং একথা সত্য যে, ইসলামের ইতিহাসে কেউ যদি আইন প্রণয়নকারীরূপে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। এই দিক দিয়ে তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় তাঁর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তিনি পারলৌকিক সমস্যা-সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকিক সমস্যাসমূহ সমাধানেও পরিপূর্ণ ও গুরুত্ব প্রদান করছেন।

মানব সভ্যতার দাবিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। রাজ্যবিস্তার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কল্যাণে বহু জটিল ও অপরিহার্য সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁর শিক্ষা সঙ্কটপরিপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হতো। রাজ্য পরিচালনায় এসবের কোনো তুলনা নেই। তাঁর অগণিত ছাত্র বহু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শান্তশিষ্ট ও সুবোধ বালকের ন্যায় তাঁর পদপ্রান্তে বসে তাঁর উপদেশামৃত পান করতেন। তাঁর নির্দেশ মতই তাঁরা রাজ্য পরিচালনা করতেন।

এছাড়াও তিনি স্বয়ং একজন বিরাট আইন প্রণয়নকারী ছিলেন। তিনি মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি সমস্যাকে অসাধারণ বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে দেখতেন। আর অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এদের সমাধান করতেন। ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কে বহুকিছু নজির পেশ করছেন। আমরা নিম্নে দুয়েকটি উল্লেখ করলাম। এখন আমরা শুধু সেই সবেরই অবতারণা করবো যে কারণে হানাফী ফিকহকে অপরাপর ফিকহের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।

## হানাফী ফিকহ ও বুদ্ধি-কষ্টিপাথর

মাসআলা-রহস্য ও মঙ্গল সাধন প্রচেষ্টা হানাফী মাযহাবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হতেই



দুইটি দল কায়েম হয়েছিল। এক দলের অভিমত হচ্ছে, শুধু ইবাদতের সাথেই শরীয়তের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এতে অন্য কোনো রহস্য বা মঙ্গলামঙ্গলের সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করছেন যে, মদ্যপান, জুয়া ও চুরি শুধু এজন্য নিন্দনীয় যে, শরীয়ত এসব নিষেধ করছেন। আর যাকাত প্রদান ও দান-দক্ষিণা এজন্য প্রশংসনীয় যে, শরীয়ত এ সম্পর্কে সবিশেষ জোর প্রদান করে থাকে। এছাড়া এর নিজস্ব দিক দিয়ে ভালো বা মন্দ বলে কোনো কিছু নেই।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এরও এই দিকেই ঝোঁক ছিল। আর সম্ভবত সেই একই কারণে ইমাম আবুল হাসান আশ-আশআরী (রহ.) যিনি শাফিয়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইলমে কলামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনিও এটাকে কেন্দ্র করেই ইলমে কালামের ভিত্তি পত্তন করেন।

দ্বিতীয় দলের অভিমত হলো শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মঙ্গলরসে ভরপুর। অবশ্য এমন কতিপয় প্রশ্নও রয়েছে যে, সাধারণ লোক এতে কি মঙ্গল নিহিত রয়েছে তা বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসবের কোনোটাই মঙ্গলশূন্য নয়। এই সমস্যা সম্পর্কে যদিও উভয় দলেই বহু জবরদস্ত আলেম রয়েছেন এবং এটি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, তবুও ন্যায়ের চোখে দেখতে গেলে,এতে আদৌ গুরুত্ব প্রদান করা চলে না।

কালামে ইলাহীর প্রতি লক্ষ করলেই আমাদের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পাক কুরআনের এই সৌন্দর্যই কাফিরদের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্র। নামাযে কি মঙ্গল নিহিত রয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

'নিশ্চয় নামায নির্লজ্জতা ও অবাধ্যতা হতে বিরত রাখে।'[১]

আর রোযা যে ফরয তা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

'যেন তোমরা পরহেজগার হতে পার।'[২]

জিহাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-আনকাবুত*, ২৯:৪৫

[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:১৮৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ﴿١٩٣﴾

'এ পর্যন্ত যেন কোনো অশান্তি-উপদ্রব না থাকে।'[১]

অর্থাৎ নামায একটি ইবাদতও বটে। কিন্তু এই ইবাদত দ্বারা যে শুধু আল্লাহর নৈকট্যই লাভ করা যায় তা নয়, বরং নৈতিক চরিত্রের ওপরও এর বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি নিহিত আছে। আর রোযা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সংযমী হওয়ার পর্যাপ্ত সাহায্য হয়ে থাকে। আর জিহাদ দ্বারা যে শুধু ইসলামের শত্রুকুলই ধ্বংস হয়ে থাকে তা নয়, বরং সত্যকে বিজয়ী ও অসত্যের ধ্বংস সাধনে এটিই একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

এ মহান অস্ত্রের সাহায্যে অসত্যকে চির-বিনষ্ট করতে পারলে, অসত্য আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তখন এ ধরাপৃষ্ঠে সত্যের রাজ্যই শুধু চলতে থাকে। এভাবে বিশ্বচরাচর এই মহা অনিষ্টের হাত থেকে রেহাই পেয়েই এক অদ্বিতীয় মহামঙ্গল ধনে মহাধনী হয়ে ওঠে। ইসলাম শুধু পরকালের গান গেয়েই এটার সুর নিঃশেষ করেনি। এর প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধ ইহ-পরকালের মঙ্গলরসে ভরপুর। এটি কোনো কবির কবিত্ব বা ভাবুকের ভাবাতিশয্য নয়। ইসলামের ইতিহাস এবং পবিত্র কুরআন-হাদীস এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

মুসলমানগণ ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে তাঁদের জন্মভূমি মক্কা-শরীফ পরিত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র, পরিবার ও সহায়-সম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে একদিন আবিসিনিয়া ও মদীনায় হিজরত করেছিলেন এবং রাহমতে আলমকেও একদিন জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবী-জীবনের মক্কায় তেরটি বছর এবং মদীনায় দশ বছরকাল, সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর খিলাফতের দুই বছর এবং ফারুকে আযম হযরত ওমর (রায.)-এর খিলাফতের দশ বছর এই পঁয়ত্রিশটি বছরের মধ্যে আবিসিনিয়া ও মদীনা হতে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদেরকে শুধু মক্কা বিজয়েই পরিতুষ্ট থাকতে দেখিনি, বরং তাঁদের সম্মিলিতভাবে প্রকৃত মুসলিম জীবন যাপনের ফলে স্পেন হতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত এক অপ্রতিহত বিরাট ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভ দেখেছি। পবিত্র মহাসত্যে ভরপুর।

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:১৯৩



পবিত্র কুরআন শরীফে বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করা হয়েছে,

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ﴿٦٤﴾

'যারা ইসলামের হুবুহু অনুকরণ করবে তাদের জন্য ইহ-পরকালের পরম সুসংবাদ রয়েছে।'[১]

আর যারা ইসলামকে অমান্য ও অস্বীকার করবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ﴿٨٥﴾

'অনন্তর যারা কাফির হয়েছে, আমি তাদেরকে ইহ-পরকালে চরম দুর্গতির ভাগী করব।'[২]

ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (রহ.) বলেন,

الْمُلْكُ وَالدِّيْنُ تَوْأَمَانِ.

'ইসলাম ও রাজত্ব একই গর্ভের দুইটি যমজ সন্তান।'[৩]

মাতৃগর্ভের যখন দুইটি সন্তান জন্মে, তখন একটি ভূমিষ্ট হয়, অপরটি ভূমিষ্ট হয়নি, এমন হয় না। তদ্রূপ ইসলাম যেখানে থাকবে, রাজত্বও সেখানে থাকবে। ইসলাম রয়েছে অথচ রাজত্ব নেই তা কস্মিনকালেও হতে পারে না। বর্তমান মুসলিমরা এসব মহাসত্য ভুলে গিয়ে একথা জানার ও বোঝার স্পৃহাও তাদের মধ্যে সজীব নেই। তাদেরকে এসব বুঝিয়ে দেওয়ার মতো লোকেরও মহা অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবুও তাই নয়, যাঁরা আজ এই বিশ্বচরাচরে পরহেজগার দীনদার বলে পরিচিত, এমনকি অতিনগণ্যসংখ্যক লোক ব্যতীত আলেম-ওলামাও নিজেরা পবিত্র কুরআন-হাদীসের পরিপূর্ণ ইসলামি জিন্দেগির সাথে অপরিচিত হয়ে উঠছেন।

মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ ও কবরস্থান ব্যতীত অপরাপর সবকিছু দুনিয়াদারদের হাতে ইজারা দিয়ে তাঁরা নীরবে সন্তুষ্টচিত্তে বসে রয়েছেন। গৃহস্থালী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজ্যশাসন ও দেশরক্ষা ইত্যাদি সবকিছু হতে

[১] আল-কুরআন, *সুরা ইউনুস*, ১০:৬৪

[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:৮৫

[৩] আল-গাযালী, *ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, খ. ১, পৃ. ১৭

তাঁরা বহুদূরে সরে পড়েছেন। অপরাপর মুসলমানগণও যদি তাঁদের পথ অবলম্বন করতেন, তবে মুসলিম জাহান একটি পরিপূর্ণ পঙ্গু জীবন-যাপন তথা বিধান-জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো। এমনকি তখন মুসলিম জাহানের বর্তমানেও যা কিছু নগণ্য অস্তিত্ব রয়েছে তাও রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় থাকত না। যে জাতির নেতা এমন অধঃপতিত ও কর্তব্য-জ্ঞান বিবর্জিত তাদের ভবিষ্যৎ কখনও উজ্জ্বল হতে পারে না।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রাযি.)-এর হৃদয়ে এ সত্য বড় রিনিঝিনি করে বেজে ওঠেছিল। তিনি মুসলিম জাহানকে এই অধঃপতন হতে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। রাজসিংহাসনে উপবেশন না করলেও এবং রাজমুকুট মাথায় একদিনের জন্য পরিধান করতে সম্মত না থাকলেও তিনি তখনকার মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র রাজত্ব করতে গেছেন। সত্য বটে, আপনহারা পথহারা তখনকার খলীফা মনসুর ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-কে আক্রোশবশত কারারুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু জনগণ, উচ্চ ও নিম্নস্থ রাজকর্মচারীবৃন্দ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর নির্দেশ শিরোধার্য করে চলতেন।

হীনউদ্দেশ্য সফল করার মানসে খলীফা মনসুর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে জেলখানায় আবদ্ধ করেছিলেন। ইমামে আযম (রহ.) জেলখানায় থাকলেও তাঁর মহান উদ্দেশ্য সফলকামে কোনো ত্রুটি হচ্ছে না বুঝতে পেরে বোকাচণ্ডি মনসুর ইমাম আযম (রহ.)-কে বিষ পান করালেন। ইমাম আযম (রহ.) বিষ-ক্রিয়া বুঝতে পেরে সাজদায় পতিত হলেন। সেই সাজদায় থেকেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁর সেই সাজদা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যময় তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সমধিক প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠল।

বিশ দিন পর্যন্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক ক্রমাগতভাবে তাঁর কবরকে সম্মুখে রেখে জানাযার নামায পড়েও তারা মনের সাধ মিটাতে পারল না। জগৎ যতোদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তিও তদ্রূপ চিরবিজয়ী থাকবে। ওলামায়ে কেরাম ও আশেকে রাসূল এবং আশেকে ইলাহীবৃন্দ আবার যদি তদ্রূপ মরণপণ হয়ে ওঠতে পারেন তবে নিশ্চয় মুসলিম-শিরে আবার ইলাহী রাজমুকুট শোভা পাবে।

মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ইমাম আবু জাফর আত-তাহাওয়ী (রহ.) এ সম্পর্কে *শরহু মাআনিল আসার* নামক এক বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। এতে



আলোচনা করছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহের মাসায়িল কুরআনের আয়াত হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত করছেন। ইমাম তাহাওয়ী (রহ.) ফিকহের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর সত্যের খাতিরে যদিও তিনি কোনো কোনো বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিরোধিতা করেছেন, তবুও তিনি প্রায় মাসআলার ব্যাপারেই মুজতাহিদ সুলভ নিয়ম-নিষ্ঠা অনুযায়ী প্রমাণ করে দেখিছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব হাদীস অনুযায়ী এবং বাহ্যিক দৃষ্টি অনুপাতেও সঠিক।

## ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযীর মতামত

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) যাকাত প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মাযহাব ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর চেয়ে অধিক সহীহ। তাঁর যুক্তির অনুকূলে তিনি বলেছেন যে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মাযহাব বুদ্ধি ও কিয়াসের কোনো ধার ধারে না। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) সেই পথকেই অধিক পছন্দ করছেন। তাঁর অভিমত হচ্ছে, যাকাতের মাসআলা এবং ইবাদতের মাসআলায় বুদ্ধি ও অভিমত প্রকাশের উপায় নেই।

অন্যান্য ইমামের তুলনায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বৈশিষ্ট্যের কারণ হচ্ছে, অন্যান্য যেসব ইমাম ফিকহ সম্পর্কে সাধনা করছেন, ফিকহের মাসায়িলকে ভিত্তি করেই তাঁদের সেই সাধনা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ইলমে কালাম ছিল ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইলম শিক্ষার ভিত্তি। এটিও তাঁর চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিশাক্তিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল।

মু'তাযিলারা বুদ্ধির নাম দিয়ে বহু কিছু করতে চেষ্টা করেছিল। কাজেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাদেরকে এবং অপরাপরদেরকে বুদ্ধির অস্ত্র দ্বারাই কাবু করতে চেষ্টা করেন। বিতর্কমূলক মাসআলায় কি রহস্য ও মঙ্গল রয়েছে তাও তিনি দেখাতে চেষ্টা করতেন। তিনি বিভিন্ন চিন্তাধারা, গবেষণা ও গুরুতত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের প্রত্যেক বিষয় বুদ্ধিসম্মত।

অপরাপর মাযহাবের সাথে হানাফী মাযহাবের ফিকহের তুলনা করলে এ পার্থক্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যান্য ফকীহদের ধারণা, ইবাদত তো ইবাদতই এতে আবার বুদ্ধির আমদানি কেন? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, ইবাদতও বুদ্ধির বাইরে কোনো কিছু নয়। ইবাদতও বুদ্ধি বিরোধী নয়।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নামায-রোযা, হজ ও যাকাত ইত্যাদি কোনো মঙ্গলের জন্য শরীয়তে ফরয করা হয়েছে। আর মঙ্গলের দৃষ্টিতে যদি দেখা

যায়, তবে কোনো পথ অলম্বনীয় হতে পারে অনুসন্ধানে পাওয়া যাবে যে, হানাফী মাযহাব যা সমর্থন করছেন তাই সেই পথ। কয়েকটি কাজের সমষ্টির নাম নামায। এখন চিন্তা করে বের করতে হবে যে, নামাযের মধ্যে কোন কাজটি ফরয, আর নামায আদায় করতে হলে কোন কাজের কি গুরুত্ব রয়েছে।

একথা সর্ববাদী সম্মত যে, আল্লাহর ভয়-ভীতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং আল্লাহর মহত্বের স্বীকৃতি নামাযের প্রাণ-কেন্দ্র। নামাযের মধ্যে সবগুলো কাজ সমান গুরুত্ব রাখে না। এর মধ্যে কিছু জরুরি ও অপরিহার্য। সেগুলো পালন করা না হলে নামাযের মূল উদ্দেশ্যেই বিনষ্ট হয়ে যায়। শরীয়তের ভাষায় সেগুলোকে ফরয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

নামাযের মধ্যে এমন কিছু বিধানও রয়েছে সেগুলো পালন করলে নামায অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু সেগুলো বাদ পড়লে নামাযের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়নি। এই শ্রেণির কাজগুলো প্রথম শ্রেণির কাজের চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন। কাজেই এগুলো সুন্নত ও মুস্তাহাব বলে পরিগণিত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং নামাযের ফরয, সুন্নত, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব ইত্যাদি কোনো বিষয়েই বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করেননি। কিন্তু এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, নামাযের মধ্যে সবগুলো কাজ বরাবর নয়। প্রত্যেক মুজতাহিদই তার শ্রেণীবিভাগে একমত হয়েছে। শ্রেণি-বিভাগে অবশ্যই সেসবের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আর এসবের নামকরণও বিভিন্ন রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও সেই একই পথের পথিক হন। তবে অপরাপর ইমামদের সাথে তাঁর পার্থক্য হচ্ছে, তিনি যে কাজটির যে রকম গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজনীয় তদ্রূপ গুরুত্বই প্রদান করেছেন। নামাযের মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হলো আরকান। অর্থাৎ এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো ব্যতীত নামায আদায় হতে পারে না। কেননা আনুগত্যের স্বীকর ও ভয়-প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে নামাযের প্রাণবস্তু।

প্রত্যেক মুজতাহিদই একমত যে, নিয়ত, তাকবীর, কিরাআত, সিজদা ইত্যাদির চেয়ে আনুগত্য স্বীকার এবং ভয় প্রকাশের অন্য কোনো উৎকৃষ্ট উপায় নেই। কাজেই এসব ফরয এবং অনিবার্য প্রয়োজন। স্বয়ং শরাহকারীগণ এসবকে অপরিহার্য ও জরুরি হওয়া সম্পর্কে ইশারা করছেন, বরং কোনো কোনো স্থলে তাঁরা এ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যাও বর্ণনা করেছেন।



অন্যান্য ইমামগণ অধিক বাড়াবাড়ি করে আরকান আদায় করার বিশেষত্বকেও ফরয বলে সাব্যস্ত করছেন। অথচ সেসব বিশেষত্ব অপরিহার্য ছিল না।

এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এসব বৈশিষ্ট্য আদায়কে ফরয বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মত হচ্ছে, তাকবীর তাহরীমা আল্লাহু আকবর না বলে এর পরিবর্তে অন্য শব্দ বললেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সেই শব্দগুলো এর সমঅর্থবোধক হওয়া চাই। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এ সম্পর্কে তাঁর সাথে একমত নন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত হচ্ছে, তাকবীর যদি ফারসি ভাষায়ও বলে দেওয়া হয়, তবুও তা জায়েয হবে।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন যে, তাতে নামায বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে কুরআনের যেকোনো একটি সূরা পাঠ করলেই কিরাআত পড়ার ফরয আদায় হয়ে যায়। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মতে, সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে নামাযই হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কোনো ব্যক্তি যদি আরবিতে কুরআন পাঠ করতে অসমর্থ হয় তবে অপরাগবশত তরজুমা পাঠ করে নিতে পারে। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মতে তরজুমা দ্বারা কোনো অবস্থাতেই নামায আদায় হতে পারে না। কিন্তু এসব হতে কেউ যেন এমন ধারণা না করেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বা অন্য কোনো মুজতাহিদ শুধু বুদ্ধি ও কিয়াস দ্বারাই নামাযের আরকান সাব্যস্ত করেছেন।

ইমামগণ এসব আরকান সাব্যস্ত করার জন্য সাধারণত হাদীসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও ইশারাসমূহকেই অবলম্বন করে থাকেন। এজন্যই প্রত্যেক মুজতাহিদের নকলী প্রমাণাদি ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত রয়েছে। এসব বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দাবি সমর্থন করার জন্য যেসব নকলী প্রমাণাদি রয়েছে, তদ্রূপভাবে বুদ্ধিগত প্রমাণাদিও সেই অনুপাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। এসব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) শরীয়তের গুরুতত্ত্ব ও মঙ্গলামঙ্গলকে কতখানি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতেন।

## হানাফী ফিকহ ও যাকাতের মাসায়িল

যাকাতের মাসআলার অবস্থাও তদ্রূপ। মানবজাতির প্রতি সাহায্য সহানুভূতির এবং দয়াপ্রদর্শন যাকাতের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য যাকাতপ্রাপ্তির জন্য সেই লোককে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে,যারা দয়া ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির

জন্য সকলের চেয়ে অধিক উপযুক্ত। ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায় করার কর্মচারী, যাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে, ঋণীব্যক্তি, মুসাফির, গাজী ও মক্তবসমূহ যাকাত পাওয়ার সমধিক উপযুক্ত পাত্র।

কুরআন শরীফে তাদের সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। কাজেই সকল মুজতাহিদ এ সম্পর্কে একমত যে, এসব লোক যাকাতপ্রাপ্তির সমধিক উপযুক্ত। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মত হচ্ছে, এসব লোক ব্যতীত অপর লোককে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বলছেন যে, যাকাত যেন আট ব্যক্তির বাইরে না যায়। এখন প্রশ্ন রইল যে, যাকাত কি উক্ত আট ব্যক্তিকে দিতে হবে, নাকি তাদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তিকে দিতে হবে। সাময়িক প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর সেই সময়কার বিচারক কাকে যাকাত দিতে হবে তাও বলে দেবেন।

## হানাফী ফিকহ অতিসহজ ও সরল

হানাফী ফিকহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যান্য ফিকহের তুলনায় অত্যন্ত সরল। কুরআন মজীদের কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের সাথে সদয় সস্নেহ ব্যবহার করতে চান। তিনি কাঠিন্য চান না।' আল্লাহর রাসূল বলছেন, 'আমি কোমল সহজ শরীয়ত নিয়ে এসেছি।' একথা সন্দেহাতীত যে, অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে, এটি বৈরাগ্যমুক্ত। এর বিধান অত্যন্ত সহজ-সরল। এটি অতিসহজসাধ্য।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসায়িলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি অতিকোমল ও সহজ-সরল, আর অপরাপর ইমামদের অত্যন্ত শক্ত এবং তা পালন করা সহজ-সরল ব্যাপার নয়। উদাহরণস্বরূপ কিতাবুল খিয়ানত ও কিতাবুল হুদুদের উল্লেখ করা যায়। সেখানে চুরির আদেশ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় পেশ করছি।

এ সম্পর্কে তো সকলেই একমত যে, হাত কেটে ফেলাই চুরির শাস্তি। কিন্তু মুজতাহিদীন চুরি সম্পর্কে কয়েক শ্রেণিবিভাগ করেছেন। সেই শর্তগুলো পাওয়া না গেলে চুরির শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা যায় না। সেসব শর্ত অনুযায়ী আদেশাবলির প্রতি যেভাবে ক্রিয়া করে, তাতেই বোঝা যাবে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব কি ধরনের সহজ এবং তা কতখানি সত্যের সমর্থনকারী।



ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে কমপক্ষে এক আশরাফী চুরি করলে তাকে চুরির শাস্তি দিতে হবে। সেই পরিমাণ চুরিতে যদি কয়েক ব্যক্তি শামিল হয় তবে কারও হাত কাটা যাবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত হচ্ছে, এক আশরাফীর চার ভাগের একভাগ চুরি করলেই প্রত্যেকের হাত কাটা যাবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, অজ্ঞ বালকের হাত কাটা যাবে না। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে তারও হাত কাটা যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না। অন্যান্য ইমামদের মতে তারও হাত কাটা যাবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একে যদি অপরের মাল চুরি করে তবে তার হাত কাটা যাবে না। এই হচ্ছে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে তারও হাত কাটা যাবে। পুত্র যদি বাপের ধন চুরি করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে তার হাত কাটা যাবে না।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে তারও হাত কাটা যাবে। কুরআন মজীদ চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে তার হাত কাটা যাবে। লাকড়ি বা যে বস্তু সহেজ নষ্ট হয়ে যায় তা চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। অন্যান্য ইমামের মতে হাত কাটা যাবে।

## হানাফী ফিকহ অত্যন্ত ব্যাপক ও সভ্যতা-মুখী

মানব জীবনের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মানবজীবনের বহুকিছু সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে এই ব্যবসা-বাণিজ্য উৎস হতে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মুজাতাহিদের কি কি অভিন্ন মতামত রয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে কার দৃষ্টি কতোখানি সুদূরপ্রসারী তা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) সবকিছুর ব্যাপারে গোপনভাবে সাক্ষ্য-প্রদানকে না-জায়েয বলে সাব্যস্ত করছেন। তিনি বিয়ের সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য ও ন্যায়পরায়ন হওয়া অপরিহার্য বলে প্রকাশ করেছেন। অমুসলিমরা নিজেদের মধ্যেও একে অপরের সাক্ষ্য প্রদানকে তিনি না-জায়েয বলে রায় দিয়েছেন।

যেসব সভ্যতা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়নি সেসব দেশে এসব চলতে পারে। অথবা জীবিকা নির্বাহ বা ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে প্রাথমিক অবস্থায়

রয়েছে সেখানে এসব ব্যবস্থা চালু হতে পারে। কিন্তু যেসব দেশে সভ্যতা চরম সীমানায় উপনীত হয়েছে, জীবিকা-নির্বাহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে সঙ্কটে পরিপূর্ণ, সেখানে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সুদূরপ্রসারী সমাধান ব্যতীত উপায় নেই। এ কারণেই এসব ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন (রহ.) লিখেছেন, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব সেসব দেশে প্রচলিত হয়েছে, যেখানে সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেনি। এ কারণেই ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাসআলায় সভ্যতার দাবি সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা দেখতে পাওয়া যায় না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তখনকার দিনে জীবন-সংগ্রাম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম মীমাংসার পরিচয় দান করছেন তাতে তাঁর জ্ঞানবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার চরম পরাকাষ্ঠই প্রতিপন্ন করে দেয়।[১]

## শরীয়ত ও হানাফী মাযহাব

কুরআন-হাদীস থেকেই মুজতাহিদীন আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে যেসব পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে মতবিরোধ রয়ে গেছে। হানাফী মাযহাবের বিশেষত্ব হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাধারণত অত্যন্ত শক্তিশালী ও দলিলযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন। শব্দ দ্বারা সাধরণত কুরআন-হাদীসকে বোঝানো হয়ে থাকে। কুরআন ব্যতীত যা হাদীস হতে গ্রহণ করা হয় তাকেও শরীয়ত বলা হয়। কিন্তু এখানে সেই প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা করা হবে না। এর কতকগুলো কারণও রয়েছে।

প্রথম কারণ হচ্ছে, এই জাতীয় মাসআলার সংখ্যা খুব বেশি। এসবের একটি মাসআলা উল্লেখ করা যায়, তবে তখনও মন্দ ধারণা করার সুযোগ থাকবে যে, কয়েকটি শক্তিশালী মাসায়িল নেওয়া হয়েছে এবং দুর্বলগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আজকাল মুজতাহিদসুলভ কোনোকিছুই মীমাংসা করা হয় না। হাদীসটি কিভাবে, কার রিওয়ায়াত হতে পাওয়া গেছে, তাই হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

মুজতাহিদীনদের মধ্যে শতবিধ মতবিরোধ হওয়ার এটিই মূল কারণ। এক ইমামের কাছে একটি হাদীস প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়ে থাকে। অপর

[১] ইবনে খালদুন, *তারীখু ইবনি খালদুন*, খ. ১, পৃ. ৫৬৯



ইমাম সেই সম্পর্কে অন্যমত পোষণ করেন। কাজেই এসবের মীমাংসার জন্য আমাদের কাছে যা কিছু সম্বল রয়েছে তা আদৌ যথেষ্ট নয়। কাজেই কোনো মাসআলা সম্পর্কে মুজতাহিদসুলভ মীমাংসা করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

আমাদের দেশে এ সম্পর্কে *তাহযীবুল কামাল*, *তাহযীবুল তাহযীব*, *মিযানুল ই'তিদাল*, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* ইত্যাদি কিতাব রয়েছে। এগুলোতে মতবিরোধ ও মতানৈক্য সম্পর্কে ইমামদের যেসব মতামত বর্ণিত রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসবের সনদের ধারাবাহিকতার উল্লেখ নেই। কাজেই মুহাদ্দিসসুলভ প্রমাণাদি দ্বারা এসবের চরম মীমাংসা করা সম্ভবপর নয়। এছাড়াও অধিকাংশ মতবিরোধই সংশয়পূর্ণ।

মুফাসসিরগণ এসবের যে মীমাংসা করছেন তাও সংশয়শূন্য নয়। হানাফী ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে বহুকিছু কিতাব লিখছেন। এসব বিষয়ে মীমাংসার নিমিত্ত কুরআন অমোঘ অস্ত্র। কারণ কুরআন দ্বারা যা কিছু মীমাংসা হয়ে যায় সেই সম্পর্কে কারও কোনো সংশয় থাকতে পারে না। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, কুরআন দ্বারা যা কিছু মীমাংসিত হয় তা অকাট্য।

## হানাফী ফিকহ হাদীস-বিরোধী নয়

যদি আমরা শুধু সেসব মাসআলা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে হতে পারি যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবুও হাদীস সম্পর্কেও আমাদের বহু কিছু বলার রয়েছে, যে সম্পর্কে কারও মন্দ ধারণা পোষণ করার কোনো কিছুই নেই। অনেকে এমন ধারণাও করে থাকে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বহু অভিমত সহীহ হাদীসের বিরোধী। অনেকে এমন অভিযোগও করছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) জ্ঞাতসারেই বহু হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। অনেকের খোশ খেয়াল হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জমানা পর্যন্ত হাদীস সংকলন সুনিয়ন্ত্রিত হয়নি। এজন্য বহু হাদীস তাঁর কাছে পৌঁছেনি। কিন্তু এসব খেয়াল অবান্তর ও ভিত্তিহীন।

আমরা যদি স্বীকার করি যে, তখনও হাদীস সংকলিত হয়নি। তবে এটা কিভাবে সম্ভবপর যে, হাদীস যখন সংকলিত হলো তখন নামজাদা মুহাদ্দিসীন যাঁরা *সহীহ আল-বুখারী*তে বিপুলভাবে স্থান পেয়েছে এবং যাঁদের সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলতেন, আমি তাঁদের চেয়ে অধিক

দেখিনি। তাঁরা সকলেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তকলীদ (অনুসরণ) করতেন।

রিওয়ায়াত যাচাই ও সংশোধনের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.) অধিকাংশ মাসআলা সম্পর্কেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তকলীদ করতেন। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাওয়ী (রহ.) হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি মাযহাব সম্পর্কে মুজতাহিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি প্রথমে শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তিনি আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুসারী হন।

ইমাম আবু জাফর আত-তাহাওয়ী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আর তখন হাদীস সংকলন পূর্ণত্ব লাভ করেছিল। পরবর্তী জমানায় ইমাম ইমাদুদ্দীন আল-মারিদীনী ও ইমাম কাসিম ইবনে কুতলুবাগা (রহ.) প্রমুখকে কে অদূরদর্শী বলার সাহস রাখে! তাঁদের প্রায় সকলই হানাফী মাযহাবের সমর্থক ছিলেন।

এছাড়াও অপরাপর যেসব লোককে হাফিযুল হাদীস বলে তসলীম করা হয়ে থাকে তাঁরাও আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসআলা-ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রথম শ্রেণির জবরদস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) পরম গৌরবের সাথে তাঁকে উস্তাদ বলে স্বীকার করতেন। তাঁর বহু হাদীস ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বিরোধী ছিল এবং তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পক্ষাবলম্বন করতেন।

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খাওয়ারজামী (রহ.) লিখেছেন, ছোটখাট ও শাখা-উপশাখা ব্যতীত মূল ফিকহ সংক্রান্ত দেড় শত মাসআলা সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে একমত এবং সেই অনুপাতে তিনি ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বিরোধী। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-কে মুহাদ্দিসীন ইমামুল মুহাদ্দিসীন বলে তসলীম করতেন। তাঁর মাসায়িল ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসায়িল অনুযায়ী ছিল।

ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম! ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) আমার চেয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অধিক ভক্ত। *সুনানুন তিরমিযী*তে ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-এর বহু মাসআলা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে প্রায়গুলোই ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বিরোধী এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সমর্থনকারী।



## এক তায়াম্মুমে কয়টি ফরয আদায় হতে পারে

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা কয়েকটি ফরয আদায় হতে পারে। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মত হচ্ছে, প্রত্যেক ফরযের জন্য নতুন তায়াম্মুম জরুরি। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীল হচ্ছে, অযুর আদেশের যে রকম ক্ষমতা তায়াম্মুমের আদেশেরও সেই একই ক্ষমতা রয়েছে। প্রত্যেক নামাযের জন্য যেরূপ নতুন অযু জরুরি নয়, প্রত্যেক নামাযের জন্য তায়াম্মুমও তদ্রূপ। কিন্তু যাদের মাযহাব হচ্ছে, এক অযু দ্বারা কয়েকবার নামায আদায় হতে পারে না, তাঁদের মত অনুযায়ী তায়াম্মুমের জন্যও সেই একই আদেশ।

## পানি ও তায়াম্মুম

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত হচ্ছে, পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম চলে যাবে। ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর বিরোধী। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দলীল হিসেবে বলেছেন যে, কুরআনে তায়াম্মুমকে 'যখন পানি পাওয়া যাবে না' এই শর্তের সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পানি যখন পাওয়া গেল তখন শর্ত আর রইল না। কাজেই তায়াম্মুমও রইল না।

## প্রতিশোধ গ্রহণ

এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে যা বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অতুলনীয় তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন। মূর্খ-যুগে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হতো। ইসলাম অতিমনোরমভাবে এর প্রতিবিধান করেছেন। আর ইসলাম এমন সব বিধান জারি করেছেন যার চেয়ে উত্তম বিধান আর কিছুই হতে পারে না।

জাহিলী যুগে নিহত ও হত্যাকারীর পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রতিশোধ নেওয়া হতো। যারা সম্মানিত সম্প্রদায়ের লোক ছিল তারা অপর সম্প্রদায়ের লোক হতে এমন প্রতিশোধ নিত যে, স্বীয় গোলামের পরিবর্তে তাদের পুরুষকে এবং স্বীয় পুরুষের পরিবর্তে অপর সম্প্রদায়ের দু'জন পুরুষকে হত্যা করত। আল্লাহ প্রতিশোধ সম্পর্কে সাধারণ আদেশ প্রচার করলেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, প্রতিশোধের আদেশ কোনো সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। হত্যাকারী সর্বাবস্থায় নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে বাধ্য হবে, ভদ্র-অভদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, গোলাম

ও স্বাধীন এবং মুসলমান ও জিম্মি প্রত্যেক একই নিয়মের অধীন। এর পূর্বে আরবদেশে এ সম্পর্কে যে অবিচার ছিল তা রহিত হয়ে গেল। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ঘোষণা করছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ

'নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ লিপিবদ্ধ হলে আজাদের পরিবর্তে আজাদ, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের পরিবর্তে স্ত্রীলোক।'[১]

জাহিলী যুগে এটাও প্রচলিত ছিল যে, ইচ্ছাপূর্বক খুনের পরিবর্তে আর্থিক দণ্ড দেওয়া যথেষ্ট মনে করা হতো। এটাকে দীয়ত বলা হয়। ইসলাম এটাকে বাতিল করে দিল। আর দীয়ত যা এক প্রকার জরিমানা, তা শুধু ইচ্ছাপূর্বক কিনা সন্দিগ্ধ ব্যাপারে এবং ভুলবশত হত্যার অবস্থায় জায়েয রাখা হয়েছে। আর এর পরিমাণ মুসলমান ও জিম্মির ব্যাপারে এক বরাবর। অনন্তর কুরআনে ঘোষণা রয়েছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ

'এবং মুসলমানদের পক্ষে উচিত নয় যে, কোনো মুসলমানকে খুন করবে। কিন্তু কেউ ভুলবশত যদি কোনো মুসলমানকে হত্যা করে তাহলে একটি গোলামকে মুক্ত করে দেবে এবং ক্ষমা না করলে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে দিয়ত দিতে হবে। আর নিহত ব্যক্তি যদি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা মুসলমানদের দুশমন এবং সে নিজে মুসলমান, তবে এক মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে। আর নিহত ব্যক্তি যদি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয় যে, তাদের ও তোমাদের মধ্যে সন্ধি রয়েছে, তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে দীয়ত দিতে হবে এবং এক মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে।'[২]

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:১৮৭
[২] আল-কুরআন, *সুরা আন-নিসা*, ৪:৯২



এসব আদেশ অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এ মতেরই সমর্থনকারী। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এ সম্পর্কে বিরোধিতা করছেন।

প্রথম মতবিরোধ হচ্ছে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত হচ্ছে, গোলামের পরিবর্তে আজাদকে নিহত করা বিধেয় নয়। স্বাধীন ও পরাধীনের মধ্যে এ ধরনের নির্দয় বিধান কখনও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় না। (স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন) দ্বারা যদি কেউ এটা প্রমাণ করতে চান তবে (স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রীলোক) দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, স্ত্রীলোকের পরিবর্তে পুরুষকে খুন করা যায়। অথচ এরকম দাবি কেউই করেননি।

দ্বিতীয় মতবিরোধ হচ্ছে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.) জিম্মিদের দীয়ত মুসলমানদের দীয়ত হতে কম সাব্যস্ত করছেন। অথচ আল্লাহ মুমিনের দীয়ত সম্পর্কে যেকয়টি শব্দ ব্যবহার করেছেন, মুসলমানদের সাথে যারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ তাদের সম্পর্কেও সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি অবশ্য ইসলামের অতিউদার নীতি যে, তাতে মুসলমান ও জিম্মিদের সম্পর্কে একই নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপ হচ্ছে, এমন উদার নীতি সম্পর্কেও অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় মতবিরোধ হচ্ছে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ইচ্ছাপূর্বক খুনের পরিবর্তেও অর্থ-দণ্ড আদায় করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। অথচ কুরআন-মজীদে ইচ্ছাপূর্বক খুনের ব্যাপারে প্রতিশোধের বিধান রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই অবস্থায় দীয়তের কোথাও বন্দোবস্ত রাখা হয়নি। আর বিবেক তাই সমর্থন করে থাকে। জাহিলী যুগে হত্যাকে একটি দেওয়ানি ব্যাপার বলে বিবেচনা করা হতো। এর কারণ হচ্ছে, অর্থের পরিবর্তেই এই দায় হতে রক্ষা পাওয়া যেতো। কিন্তু ইসলাম কখনও এমন ভুল নীতির সমর্থন করেনি।

চতুর্থ মতবিরোধ হচ্ছে, ইমাম শাফিয়ী (রহ.) একইভাবে হত্যার পরিবর্তে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার বিধান দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি কাউকেও পাথর দ্বারা মাথা ফাটিয়ে মেরে থাকে তবে তাকেও পাথর দ্বারা মেরে ফেলতে হবে বা কোনো ব্যক্তি যদি আগুন দ্বারা কাউকেও জ্বালিয়ে মেরে থাকে তবে তাকেও আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে মারতে হবে। কিন্তু কুরআনের কোথাও এর সমর্থন পাওয়া যায় না।

পঞ্চম মতবিরোধ হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ব্যাপারে কাফফারার কোনো বিধান নেই। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহ.) প্রতিশোধ ও কাফফারা উভয়েরই বিধান রেখেছেন। অথচ কুরআন মজীদে ভুলবশত খুনের ব্যাপারে কাফফারা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ইচ্ছাপূর্বক খুনের পরিবর্তে কোথাও কাফফারা সীমাবদ্ধ উল্লেখ নেই।

## অংশবণ্টন

অংশবণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সেসব প্রশ্নের সমাধানকল্পে যে নীতির অনুসরণ করেছেন, কুরআন-মজীদে তার সমর্থন রয়েছে। অংশবণ্টন সম্পর্কেও ইসলাম সে নীতির অনুসরণ করেছে, তা দুনিয়ার অন্যসব নীতি হতে পৃথক। ইসলামের প্রতি এমন সূক্ষ্ম ও সুন্দর যে, তা দেখেই মনে হয় আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউই বিধান দিতে পারে না।

বণ্টনের মূল আইন হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যদি কাউকেও কোনো সম্পত্তি দিয়ে যায় তবে সে তা পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি তেমন কিছু বলে না যায়, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, স্বভাবত তার আত্মীয় কে কে রয়েছে এবং যে যতো বেশি তার কাছের আত্মীয় হবে সে ততো বেশি মালের অধিকারী হবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি সে অনুযায়ী কাজ করতে বলে গিয়ে থাকে তখনও একই কথা। অন্যান্য জাতির ধারণা হচ্ছে, সম্পত্তি বহু লোকের মধ্যে বণ্টন হয়ে গেলে সে সম্পত্তি দ্বারা কেউই তেমন কোনো উপকার লাভ করতে পারে না।

খ্রিস্টানদের আইনমতে বড় ছেলে সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে, অপর ভাই সেই সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে শুধু পুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায়, মেয়েরা কোনো সম্পত্তির ভাগী হয় না। মৃত ব্যক্তির বাপ-ভাই এর কোনো অংশপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ইসলাম এসবকে অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে থাকে। ইসলামের এ সম্পর্কে তিনটি শ্রেণিভাগ রয়েছে।

## ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিখ্যাত ছাত্র

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অসংখ্য ছাত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত বিশিষ্ট চল্লিশজনকে নিয়ে তিনি কমিটি গঠন করেন নিম্নে তাঁদের



কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো। ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম যুফার (রহ.), ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (রহ.), ইমাম দাউদ আত-তায়ী (রহ.), কাসিম ইবনে মা'ন (রহ.), কাযী আলী ইবনে মুসহির (রহ.), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়িদা (রহ.), ইমাম হিব্বান ইবনে আলী (রহ.) ও ইমাম মানদাল ইবনে আলী (রহ.)। তাঁদের কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

## মুহাদ্দিস-ছাত্র

### ১. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.)

তিনি সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহকে একটি ধারাবাহিক বিষয়বস্তু হিসেবে কায়েম করতে চেষ্টা করেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *মিযানুল ই'তিদাল* কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন যে, এ সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কিত্তান (রহ.) সর্বপ্রথম কলম ধরেন। তারপর তাঁর ছাত্রবৃন্দ হতে ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহ.), আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও ওমর ইবনে আলীউল ফালাস (রহ.) এ সম্পর্কে বহু খেদমত করেন।

তারপর ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর এ বিষয়ে বিরাট দান রয়েছে। হাদীস সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.)-এর দৃষ্টি এতোদূর সুদূরপ্রসারী ছিল যে, তিনি যখন হাদীসের মজলিসে উপবেশন করতেন তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীসের তাহকীক করার জন্য আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আসরের নামাযের পর হতে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত সেই মজলিস চলত। তাঁরা সেই সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন।

রিওয়ায়াত সম্পর্কে তাহকীক, যাচাই ও নির্বাচন সম্পর্কে তিনি এমন পূর্ণতা লাভ করেছিলেন যে, হাদীসের অধিকাংশ ইমামমের মত হচ্ছে, তিনি যে হাদীসকে ছেড়ে দিয়েছেন আমরাও তা ছেড়ে দেব। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) জোরেসোরে বলতেন, আমার চক্ষুদুইটি দ্বারা ইয়াহইয়া (রহ.)-এর অনুরূপ কাউকেও দেখিনি। তার এতসব গুণ-গরিমা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিক্ষা মজলিসে প্রায়ই যোগদান করতেন। আর তিনি যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র এ সম্পর্কে গৌরব করে বেড়াতেন।

তখনও কারও তকলীদ করা ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত হয়নি। তবুও অধিকাংশ মাসআলার ব্যাপারে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তকলীদ করতেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, অধিকাংশ মাসায়িল সম্পর্কেই আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তকলীদ করেছি। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাযকিরাতুল হাফ্‌ফায* কিতাবে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (রহ.)-এর প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, ওয়াকী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.) হিজরী ১৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাসরা শহরে হিজরী ১৯৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

## ২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)

মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী (রহ.) *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত* কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন, তিনি এমন একজন ইমাম যে, তাঁর নেতৃত্ব ও তেজস্বীতা সম্পর্কে সকল ইমাম ও ফকীহগণ একমত। তাঁর প্রসঙ্গ বর্ণনা করলে আল্লাহর রহমত নাযিল হতো। তাঁর সাথে ভালবাসা জন্মাতে পারলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাপ্তির আশা করা যেত।

মুহাদ্দিসীন তাঁকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলে অভিহিত করতেন। এতে বোঝা যায়, হাদীসে তাঁর কিরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁর জনৈক ছাত্র তাঁকে একদিন হে আলিমুল মাশরিক আহ্বান করলেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একথা শুনে বললেন, আপনি বড় কৃপণতা করলেন। তিনি শুধু আলেমুল মাশরিক নন, তিনি আলিমুল মাগরিবও বটে।

ইমাম আহমদ হাম্বল (রহ.) বলেন, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর জমানায় তাঁর চেয়ে অপর কেউই হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য অধিক চেষ্টা করেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আমি চার হাজার শায়খের কাছ হতে হাদীস শিখেছি। তাঁদের মধ্যে শুধু এক হাজার শায়খের কাছ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছি।

*সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমে* হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) হতে অসংখ্য হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে। রিওয়ায়াতশাস্ত্রে তিনি একজন মহাস্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। হাদীস ও ফিকহ সম্পর্কে তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, এসব কিতাব আজকাল পাওয়া যায়



না। পরহেজগারি, দীনদারি, জ্ঞান-গরিমা, বুযুর্গি ও কামালিয়াতে তিনি এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, নামজাদা আমীর-ওমরা ও রাজা-মহারাজা তাঁর তুলনায় অতিতুচ্ছ ছিলেন।

বিশ্ববিখ্যাত বাদশা হারুনুর রশীদ একদিন কোনো এক স্থানে যান। সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর পৌঁছার সংবাদ ঝড়বেগে চারদিকে ছড়ায়ে পড়ল। তখন অসংখ্য লোক তাঁকে স্বাগত ও সমাদার করার জন্য উন্মাদের প্রায় ছুটে চলল। বহু লোকের জুতা ও জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল। কিন্তু এর প্রতি কারও লক্ষ্য নেই। কে কার পূর্বে আমীরুল হাদীসকে দেখবে এছাড়া লোকদের অন্য কোনো খেয়াল ছিল না।

বাদশা হারুনুর রশীদের জনৈক বিবি অট্টালিকার শিখর হতে এ দৃশ্য দেখে কার শুভাগমনে জনগণ এমন উম্মাদ হয়েছে জানতে চাইলে লোকেরা বললো, মাগরিব ও মাশরিকের আলেমের শুভাগমন হয়েছে তখন বিবি সাহেবা বলে উঠলেন, প্রকৃতপক্ষে এটাকেই বাদশাহি বলা চলে। এর তুলনায় হারুনুর রশীদের রাজত্ব অতিতুচ্ছ ব্যাপার। পুলিশ-পেয়াদা ব্যতীত জনগণ রাজা-মহারাজাকে স্বাগত-সমাদর করার জন্য কবে এমন উম্মাদ অধীর হয়ে ওঠে!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর একজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। উস্তাদের প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিভাজন ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি যাকিছু হাসিল করেছি তা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-এর অনুকম্পাক্রমেই হাসিল করেছি। একদিন তিনি মনের আবেগে বলছিলেন, আল্লাহ তাআলা যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) কর্তৃক আমাকে সাহায্য প্রদান না করতেন তবে আমি একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক কোনো কিছু হওয়ার আশা করতে পারতাম না।

## ৩. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা (রহ.)

ইয়াহইয়া বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাযকিরাতুল হুফফায* কিতাবে শুধু সেসব লোকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন, যাঁদেরকে হাফিযুল হাদীস বলা হতো। সেই কিতাবে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা (রহ.)-এর নামও স্থান পেয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিখ্যাত উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী

(রহ.) বলতেন, ইয়াহইয়ার জমানায় তাঁর সমকক্ষ আলেম অপর কেউই ছিলেন না। তাঁর রিওয়ায়াত হতে সিহাহ সিত্তার বহু হাদীস নেওয়া হয়েছে। তিনি মুহাদ্দিস ও ফকীহ উভয়ই ছিলেন। বহু বিষয়েই তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল।

তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি তাঁর উস্তাদের সাহচর্যে ছিলেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাযকিরাতুল হুফফায* কিতাবে তাঁকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরিবারস্থ লোক বলেই উপাধি দান করছেন। ফিকহ-সংকলনে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কমিটি-ভুক্ত ছিলেন। তাতে তিনি প্রধান অংশগ্রহণ করেন। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাওয়ী (রহ.) লিখেছেন যে, তিনি এতে ত্রিশ বছর পর্যন্ত লিপ্ত ছিলেন। গ্রন্থরচনা ও লিপিবদ্ধ করার ভার তাঁর ওপরই সমর্পণ করা হয়েছিল।

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর *মিযানুল ই'তিদাল* কিতাবে বর্ণিত আছে, কুফানগরে তিনিই সর্বপ্রথম হাতে কলম নেন। লোকেরা তাঁকে একজন বিখ্যাত লেখক হিসেবেই ভক্তি করত। তিনি মাদায়েনে প্রধান কাজী পদে নিযুক্ত হন। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

### ৪. হযরত ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (রহ.)

হাদীসশাস্ত্রে তাঁকে বিশিষ্ট স্তম্ভ হিসেবে গণনা করা হতো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর ছাত্র হিসেবে পরম গৌরবানুভব করতেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহ.) যাঁকে এ বিষয়ে নামজাদা বলে উপাধি দান করেছিলেন, তিনি বলতেন, হযরত ওয়াকী'র চেয়ে উপযুক্ত কাউকেও দেখিনি। এবং তাঁর রিওয়ায়াত ও মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো।

তিনিও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিশেষ ছাত্র ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাছ হতে তিনি বহু হাদীস শুনেছিলেন। প্রায় মাসআলাতেই তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তকলীদ করতেন। তাঁর মত অনুযায়ীই তিনি ফাতওয়া দান করতেন। তিনি হিজরী ১৯৭ সালে ইন্তিকাল করেন।

### ৫. হযরত শায়খ দাউদ তায়ী

খোদা তাঁকে ভালো ও সৎকর্মকে গ্রহণ করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। সুফিয়ায়ে কেরাম তাঁকে কামিল মুরশিদ হিসেবে মান্য করতেন। *তাযকিরাতুল আউলিয়া* কিতাবে তাঁর উচ্চপ্রশংসা করা হয়েছে। ফকীহগণ বিশেষভাবে হানাফী ফকীহগণ তাঁর ইজতিহাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহারিক ইবনে আত্তার (রহ.) বলতেন, হযরত দাউদ আত-তায়ী (রহ.) যদি পূর্ব জমানায় জন্মগ্রহণ করতেন, তবে কুরআন মজীদে তাঁর কাহিনি বর্ণিত হতো।



প্রাথমিক জীবনেই তিনি ফিকহ ও হাদীস সম্পর্কে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অতঃপর ইলমে কালাম সম্পর্কে তিনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তখন হতে তিনি তর্ক-বিতর্কশাস্ত্রে বিশেষভাবে মেতে ওঠেন। একদিন এক ব্যক্তির সাথে কোনো এক বিষয়ে তর্ক করতে করতে তিনি সেই ব্যক্তির প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। তখন লোকটি বলে ওঠল, দাউদ! আপনার জবান ও হাত অধিক বর্ধিত হোক। এই শব্দকয়টি তাঁর জীবনে বহু পরিবর্তন আনয়ন করল। তিনি তখন হতে তর্ক ও বহস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু জ্ঞান-তৃষ্ণা তখনও তিনি পরিহার করেননি। এর সবকিছুর সাথে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.) বলেন, আমি প্রায়ই হযরত দাউদ (রহ.)-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে যেতাম। জরুরি ও আমলী মাসআলা হলে তিনি জবাব দিতেন। অন্যথায় বলে দিতেন, ভাই আমার অন্য জরুরি কাজ রয়েছে। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একজন নামজাদা ছাত্র ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নির্বাচিত কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি হিজরী ১৬০ সালে ইন্তিকাল করেন।

উল্লিখিত বুযুর্গগণ ব্যতীত ফযল ইবনে মুসা (রহ.), হামযা ইবনে হাবীবুয যাইয়াত (রহ.), ইবরাহীম ইবনে তুমহান (রহ.), সাঈদ ইবনে আউস (রহ.) ও ওমর ইবনে মাইমুনা (রহ.) প্রমুখ বহু বুযুর্গও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। আমরা এখানে শুধু সেসব ছাত্রের কতিপয় নাম উল্লেখ করেছি, যাঁরা খুব বিখ্যাত এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে সর্বকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

### ৬. ফিকহ-বিশারদ কাজী ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)

তাঁর উপযুক্ততা, উচ্চ মর্যাদা এবং পদ-গৌরব সম্পর্কে একটি পৃথক বই লিখলে তিনি যে কে ছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান গভীরতা কতখানি ছিল তা প্রকাশ করা সম্ভবপর হতো। কাউকেও যদি আল্লাহ সেই তাওফীক দেন তবে

আমাদের সেই বাসনা পূর্ণ হতে পারে। এই কিতাবের বিষয়বস্তু হিসেবে আমাদের ওপর এতোখানি ফরয যে, তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

তিনি আনসার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আসহাবের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁর পিতা একজন অতিদরিদ্র লোক ছিলেন। শারীরিক পরিশ্রম করে তিনি জীবিকা-নির্বাহ করতেন। তিনি হিজরী একশত তের বা সতের সালে কুফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই লেখাপড়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু তাঁর পিতার তাতে সম্মতি ছিল না।

ছেলে কোনো কাজকর্ম করে দুই চার পয়সা করে অর্জন করে সংসারের সুখ-বৃদ্ধি করবে এটাই তাঁর আব্বাজানের কামনা ছিল। কিন্তু বালক আবু ইউসুফ (রহ.) একটু অবসর বা সুযোগ পেলেই আলেমদের সাহচর্যে গিয়ে বসতেন। বালকটি একদিন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শিক্ষা-মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর পিতা তাঁকে জোর-জবরদস্তিতে সেখান হতে নিয়ে আসলেন। ঘরে গিয়ে পুত্রকে বুঝিয়ে বললেন, বাবু! ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে আল্লাহ পাক ইচ্ছা ও ধন সবকিছুই দান করেছেন। তোমার মতো গরীবের ছেলের পক্ষে কি সেই পথের পথিক হওয়া সম্ভব?

বালকটি বাধ্য হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করল। পিতার সাথে তাঁকেও তখন পরিশ্রম করতে হতো। দুই-চার দিন পর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) লোকদেরকে বালক আবু ইউসুফের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সবকিছু জেনে বালকটিকে ডেকে এনে সবকিছু অবগত হলেন। তিনি চুপচাপ বালকের হাতে একটি থলে দিয়ে দিলেন। বালক বাড়িতে এসে খুলে দেখেন যে, এতে একশত দিরহাম রয়েছে।

বালকটিকে তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এও বলে দিয়েছিলেন যে, এই অর্থ যখন শেষ হয়ে যাবে তখনই আমাকে তা জানাবে। তিনি বরাবরই এভাবে তাঁকে সাহায্য করে যেতে লাগলেন। পরিশেষে ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহ.) তাঁর শিক্ষার পরিসমাপ্তি করলেন। কাজী ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ব্যতীত অপরাপর বহু ইমামের কাছেও শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি ইমাম সুলাইমান আল-আ'মাশ আল-কাহিলী (রহ.) ও ইমাম হিশিম ইবনে আরওয়া (রহ.) প্রমুখের কাছ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.) হতে মগাযী ইত্যাদি কিতাব পড়েন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবু লাইলা (রহ.) হতে মাসআলা শিক্ষা করেন। আল্লাহ



তাঁকে এমনই মেধা ও স্মৃতি দান করেন যে, তিনি একই সময়ে সবকিছুর ইলমে হাসিল করেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইবনে আবদুল বার্‌র (রহ.) লিখেছেন, ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) হাদীসের ক্লাসে যোগদান করে প্রতিরোজ পঞ্চাশ ষাটটি হাদীস শিখে নিতেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যতোদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) তাঁর শিক্ষা-মজলিসে প্রতিদিন যোগদান করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) রাজ-সরকারের সাথে যোগ-স্থাপন করেন।

খলীফা মাহদী আব্বাসী হিজরী ১৬৬ সালে ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-কে কাজী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফাও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-কে কাজী পদে বহাল রাখেন। পরিশেষে বাদশা হারুনুর রশিদ তাঁর উপযুক্ততার প্রমাণ পেয়ে তাঁকে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রধান কাজী পদে নিযুক্ত করেন। আর উক্ত পদ তখন এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মুসলিম ইতিহাসে এর তদ্রূপ গুরুত্ব তার পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। যে জ্ঞান-গরিমা ও শক্তিমত্তার পরিচয় তিনি দান করেছিলেন তাঁর জীবন-চরিতে তা বর্ণনা করা সম্ভবপর হতে পারে।

ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) হিজরী ১৮২ সালে রবিউল আউওয়ালের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার যুহরের সময় ইন্তিকাল করেন। তিনি মৃত্যকালে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলে শেষ নিঃশাস পরিত্যাগ করেন, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি জানা সত্ত্বেও কোনো মীমাংসা ঘটনার বিপরীত করিনি। আমি যা কিছু মীমাংসা করেছি, তোমার কিতাব ও তোমার পয়গম্বর (সা.)-এর তরীকা অনুযায়ী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কখনও যদি মুশকিলে পড়েছি তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পথ অবলম্বন করেছি। আমি যতোটুকু অবগত রয়েছি তাতে আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস হচ্ছে, তিনি তোমার পথ অতিউত্তমরূপেই চিনতেন এবং ইচ্ছাপূর্বক তিনি তোমার পথ ছেড়ে যাননি।

ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) ধনাঢ্য লোক ছিলেন তিনি সেই ধনের সদ্ব্যবহারও করতে জানতেন। মৃত্যুর সময় তিনি অসিয়ত করে গেলেন যে, মক্কা-মদীনা, কুফা ও বাগদাদের দরিদ্রদের মধ্যে যেন চার লক্ষ দিরহাম বিলিয়ে দেওয়া হয়। ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) বিভিন্ন বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যদিও তিনি ফিকহশাস্ত্রের উন্নতি বিধানের জন্য

সুবিখ্যাত ছিলেন, তবুও অন্যান্য বিষয়েও তাঁর সমকক্ষ লোক সেই সময় ছিল না। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (রহ.) হিলাল ইবনে ইয়াহইয়ার বাণী উদ্ধৃত করেছেন,

كان أبو يوسف يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب، وكان أقل علومه الفقه، ولم يكن في أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف.

'তফসীর, মগাযী ও আইয়ামুল আরবের হাফিয ছিলেন ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)। আর ফিকহশাস্ত্র তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ-সরল বিষয় ছিল।'[১]

হাদীস সম্পর্কে তিনি এমনই পারদর্শী ছিলেন যে, তিনিও হাফিযুল হাদীসের মধ্যে পরিগণিত হয়েছেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাযকিরাতুল হুফ্ফায* কিতাবে লিখেছেন,

عن يحيى بن معين قال: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثا ولا أثبت من أبي يوسف.

'ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহ.) বলতেন যে, আহলে রায়দের মধ্যে ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর চেয়ে অধিক হাদীস আর কেউই রিওয়ায়াত করেননি।'[২]

ইমাম আবু বকর আল-খতীবুল বাগদাদী (রহ.) স্বীয় ইতিহাসে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বাণী উদ্ধৃত করছেন,

أول ما طلبت الحديث ذهبت إلى أبي يوسف القاضي.

'ইলমে হাদীসে জ্ঞান লাভ করার জন্য আমার যখন বাসনা জাগল আমি তখন ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হলাম।'[৩]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এবং হাদীসের আরও বহু ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কাছ হতে

[১] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৬, পৃ. ৩৮২, ক্রমিক: ৮২৪
[২] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায = তাবকাতুল হুফ্ফায*, খ. ১, পৃ. ২১৪, ক্রমিক: ২৭৩/৪২-৬
[৩] আল-খতীবুল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৪, পৃ. ২৫৭, ক্রমিক: ৭৫৫৮



হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর জ্ঞান গরিমা ও পদ-মর্যাদা সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক প্রমাণ আর কি থাকতে পারে।

ফিকহশাস্ত্রে ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর পাণ্ডিত্য কোনো অর্বাচীনই অস্বীকার করবে না। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও তা অম্লানবদনে স্বীকার করতেন। ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) একদিন পীড়িত ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁকে দেখার পর বাড়ি ফেরার পথে সাথীদের সঙ্গে বললেন, আল্লাহ না করুক, এই লোকটি যদি মারা যায়, তবে দুনিয়া অপূরণীয় ক্ষতির ভাগী হবে।

অন্যান্য ইমামগণও ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর অসাধারণ স্মৃতি ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে প্রশংসা পঞ্চমুখে। ইমাম সুলাইমান আল-আ'মাশ আল-কাহিলী (রহ.) সেই জমানার একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একদিন ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কাছে যেন কোনো একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করছিলেন। ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) এর জবাব দিলেন। ইমাম আ'মাশ (রহ.) বললেন, আপনার জবাবের কোনো সনদ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সনদ হলো উক্ত হাদীসটি আপনি আমাকে অমূক ঘটনা সম্পর্কে অমুক দিন বয়ান করেছিলেন।

ইমাম সুলাইমান আল-আ'মাশ আল-কাহিলী (রহ.) বললেন, 'কাজী সাহেব! এই হাদীসটি আমার তখন হতে স্মরণ রয়েছে, যখন আপনার পিতা বিয়েও করেননি। কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য আজ আমার বুঝে আসছে। ফিকহ হাদীস সম্পর্কে ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)ই সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সেসব কিতাবের মধ্যে আমরা শুধু *কিতাবুল খিরাজ* সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব।

বাদশা খলীফা হারুনুর রশীদ খিরাজ (কর) ও জিজিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিস্তৃত অভিমত জানতে চাইলে ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) তাঁর কাছে জবাবস্বরূপ কয়েকটি চিঠি প্রেরণ করেন। এই কিতাব সেই চিঠি কয়েকটিরই সমষ্টি মাত্র। এতে বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তবে খিরাজ সম্পর্কেই এতে অধিক মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এজন্যই এই কিতাবকে খিরাজ সম্পর্কে মূল আইনগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

এতে জমির ফসল উৎপাদনে জমির বিভিন্ন শক্তি, এই জাতীয় বহু মনোরম রীতি এবং সময়োপযোগী দূরদর্শিতার সমাবেশ রয়েছে। সেই

সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থাও রয়েছে। সেই জমানায় তিনি যে অপূর্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দান করছেন তা কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। এর রচনা চাতুর্য হচ্ছে, অত্যন্ত স্বাধীনভাবে অথচ উপদেশমূলক সব কিছুকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে খলীফার দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়েছে। ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর জীবন-ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বাদশা হারুনুর রশীদের ন্যায় পরম শক্তিশালী ও স্বেচ্ছাচারী বাদশার দরাবারেও তিনি স্বীয় কর্তব্য এমন স্বাধীন ও সুচারুভাবে পালন করেছেন যে, এর তুলনা এই দুনিয়ার অতিবিরল।

*কিতাবুল খিরাজ* গ্রন্থের এক স্থানে রয়েছে যে, তিনি বাদশা হারুনুর রশিদকে লিখেছেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি আপনার প্রজা সাধারণের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা দেখাতে চান তবে মাসে যদি একবারও যান যে, আপনার রাজ্যে প্রজা-বিদ্রোহ হবে না। এভাবে দুয়েকটি দরবারে যদি করেন, তবে রাজ্যময় তা প্রচার হয়ে যাবে, তাতে মাথা তুলতে কেউই সাহস পাবে না। আর সুবাদারদের কাছে যদি এ সংবাদ পৌঁছে দিন যে, আপনি বছরে একবার বিচার করবেন তবে তাতেও তাদের অত্যাচার স্পৃহা আপনা আপনি দমে যাবে।

### ৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.) ছিলেন হানাফী ফিকহের দ্বিতীয় স্তম্ভ। দিমাশকের নিকটবর্তী এক পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে ওয়াসিত চলে আসেন এবং সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) হিজরী ১৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

কুফা নগরে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি মাসআলা ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.), ইমাম মালিক ইবনে দীনার (রহ.) ও ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) প্রমুখের কাছ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। দুই বছর বয়সে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর খেদমতে কাটান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মৃত্যুর পর তিনি ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর শিক্ষাধীন ছিলেন। তারপর মদীনায় গিয়ে তিনি তিন বছর ইমাম মালিক (রহ.)-এর কাছে হাদীস পড়েন।



যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও যশ-গৌরব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ বছর বয়সেই তিনি শিক্ষকের আসনে উপবেশন করলেন। লোক-সমাজ অচিরেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। বাদশা হারুনুর রশিদ তাঁর জ্ঞান-বল ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে কাজী পদে নিযুক্ত করলেন। আর খলীফা প্রায়ই তাঁকে নিজের সঙ্গে রাখতেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যদিও জীবনের অধিকাংশ সময় রাজ-দরবারে কাটিয়ে দিয়েছেন, তবুও তিনি আজাদির রশি কখনও তাঁর হাত-ছাড়া হতে দেননি।

ইয়াহইয়া আল-আলাওয়ী নামক একব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করল। হারুনুর রশিদ তাকে যথাসময়ে দমন করলেন। সেই প্রজা তখন খলীফার সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলো। সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হলে প্রজার মন সন্তুষ্ট করার মানসে সেই সন্ধিপত্রে বড় বড় আলেম-ওলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের দস্তখত প্রদান করা হলো। ইয়াহইয়া সন্ধিপত্রে রাজি হয়ে বাগদাদে উপস্থিত হয়। এর কিছুদিন পর হারুনুর রশীদ সেই সন্ধিভঙ্গ করতে চাইলেন। খলীফার ভয়ে সকল আলেম ফাতওয়া দিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্ধি বাতিল করা দুরস্ত, কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রকশ্যভাবে এর বিরোধিতা করলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের অভিমতের ওপর কায়েম রইলেন।

আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের নিম্নলিখিত অভিমত হতে বোঝা যাবে যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) কোন উচ্চ শ্রেণির লোক ছিলেন। কোনো এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি এ ধরনের সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান কোথা হতে শিখলেন? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহ.)-এর কিতাব হতে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর শিক্ষা-মজলিস হতে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর সাহচর্য হতেই অগাধ জ্ঞান ও অপূর্ব বুযুর্গির অধিকারী হন। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) নিজেই তা অম্লান-বদনে স্বীকার করতেন।

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বাণী উদ্ধৃত করেছেন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহ.) খলীফা সমীপে মহাসম্মানিত লোক ছিলেন। আমি প্রায়ই তাঁর খেদমতে যাতায়াত করতাম। ফিকহে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে আমার মন তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরপুর হয়ে উঠত। তাঁর শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করা আমি

অপরিহার্য করে নিলাম। তাঁর পাক-মুখে আমি যাকিছু শুনতে পেতাম, তাই লিপিবদ্ধ করে নিতাম।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) স্বয়ং ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-কে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। ছাত্রদের মধ্যে ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-কে তিনি অপরিসীম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। একদিন তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে রওয়ানা হন। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎলাভের মানসে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ছাত্র ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-কে দেখতে পেয়ে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ঘোড়া হতে নেমে পড়লেন। তারপর চাকরকে বললেন, তুমি খলীফার দরবারে গিয়ে আপত্তি জানিয়ে দাও যে, আজ কোনো কারণবশত আমি দরবারে উপস্থিত হতে পারতাম না। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বললেন, আমি অন্য সময় না হয় আপনার খেদমতে হাজির হবো। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বললেন, না, দরবারে আজ তেমন কোনো কাজ নেই।

তাঁরা দু'জন মাঝে-মাঝে আপোসে তর্ক-বিতর্কও করতেন। বেশ সুদীর্ঘ সময় তাঁদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলতো। এজন্য অনেকে তাঁদেরকে ছাত্র-শিক্ষক বলে স্বীকার করতেন না। কিন্তু তখনকার জমানায় ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এসব বিষয়ে ওজর-আপত্তি ছিল না। আর প্রকৃতপক্ষে তাতে দোষের কোনো কিছুই নেই।

ইমাম মুহাম্মদ সাধারণত ফিকহের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। কিন্তু তাফসীর, হাদীস ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ জ্ঞান রাখতেন। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন, কুরআন মজীদ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর চেয়ে অভিজ্ঞ আলেম আমি অপর কাউকে পাইনি।

সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কোনো গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ইলমে ফিকহে যেসব মাসায়িল নাহবের অংশ হিসেবে পরিগণিত *আল-জামিউল কবীর* গ্রন্থে প্রায়ই এসবের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। তাতেই বোঝা যায়, সেই বিষয়েও তাঁর কিরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (রহ.) প্রমুখ অনেকে বিশেষভাবে এসবের উল্লেখ করেছেন।

হাদীস সম্পর্কে তাঁর কিতাবে *আল-মুওয়াত্তা* একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি তাঁর *কিতাবুল হজ* গ্রন্থেও বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া তিনি অসংখ্য কিতাব লিখে গেছেন। আজও তাঁর কিতাব হানাফী মাযহাবের শক্তি



বৃদ্ধি করছে। যেসব কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসায়িল রয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হয়েছে। *আল-মাবসূত* প্রকৃতপক্ষে এটি ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) লিখেছেন। তাঁর মাসআলাগুলোকে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাতেই সর্বপ্রথম কলম ধরেন।

**আল-জামিউস সগীর**

এ কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর রিওয়ায়াত হতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সব মাসআলা লিপিবদ্ধ করছেন। এতে ৫৩৩টি মাসআলা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে একশত সত্তরটি মাসআলা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবিরোধেরও উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত কিতাবে তিন রকমের মাসআলা স্থান পেয়েছে:

১. এই কিতাব ব্যতীত অন্য কোথাও এসব মাসআলা পাওয়া যায় না।
২. অন্যান্য কিতাবেও এসব মাসআলা বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) অন্যান্য কিতাবে এসব মাসআলা সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেননি। কারণ এর পেছনে তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করছেন যে, এগুলো ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসআলা।
৩. এসব মাসায়িল অন্যান্য কিতাবেও রয়েছে। কিন্তু এই কিতাবে যে ভাষায় তা বর্ণিত হয়েছে তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সেই ভাষায় কি যেন পৃথক সুর রয়েছে। এই কিতাবে ত্রিশটি হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *কাশফুয যুনুন* ইত্যাদি কিতাবে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

**আল-জামিউল কবীর**

এটি *জামিউস সগীরের* পরবর্তী কিতাব হতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসআলার সঙ্গে ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম যুফার (রহ.) মাসআলাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর প্রত্যেক মাসআলার সাথেই দলীল দেওয়া হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ইতিহাসবিদগণ ফিকহের মাসায়িল সম্পর্কে যা কিছু উসুল লিপিবদ্ধ করেছেন তার অধিকাংশই উক্ত কিতাবের ধারা অনুযায়ী রচিত হয়েছে। একাধিক ব্যাখ্যাকার উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন। *কাশফুয যুনুন* কিতাবে এসবের চল্লিশটির নাম উল্লেখ রয়েছে।

**যিয়াদত**

*জামিউল কবীর* রচিত হওয়ার পর যেসব মাসায়িল স্মরণে ছিল তাই এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এজন্য উক্ত কিতাবের নাম *যিয়াদত* রাখা হয়েছে।

**কিতাবুল হজ**

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মৃত্যুর পর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মদীনায় গমন করেন। তিনি তিন বছরকাল সেখানে অবস্থান করে ইমাম মালিক (রহ.) হতে *আল-মুওয়াত্তা* পড়েন। মদীনাবাসীগণ অন্য পথ অবলম্বনকারী ছিলেন। বহু মাসআলা সম্পর্কে তাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে মতবিরোধ করতেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মদীনা হতে ফিরে এই কিতাব লিখেছেন।

এতে সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর মদীনাবাসীদের অভিমত বর্ণনা করার পর হাদীস, আসার ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাসআলা সহীহ এবং অন্যান্যগুলো সহীহ নয়। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) *মানাকিবুল ইমাম আশ-শাফিয়ী* কিতাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন।

**সিয়ারুস সগীর ও সিয়ারুল কবীর**

এটি তাঁর সর্বশেষ রচনা। সর্বপ্রথম *সিয়ারুস সগীর* লেখা হয়। এর এক কপি ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.)-এর নজরে পড়ে। এটি দেখে ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযায়ী (রহ.) কিছুটা অবজ্ঞাভরে বললেন, ইরাকবাসীরা এ সম্পর্কে কিতাব লেখার ক্ষমতা রাখে?

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) একথা শুনে অপর একখানা সিয়ার লেখা শুরু করলেন। তা সমাপ্ত হওয়ার পর মোট ষাট খণ্ড হয়। যার নাম *সিয়ারুল কবীর*। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) সেসব কিতাব একটি খচ্চরের ওপর উঠিয়ে বাদশা হারুনুর রশীদের দরবারে নিয়ে চললেন। খলীফা খবর তা শুনতে পেয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধভ জ্ঞাপনার্থে শাহজাদাদেরকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে এগিয়ে আনার জন্য পাঠালেন।

এসব কিতাব ছাড়াও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর বেশ কিছু কিতাব রয়েছে। তাঁর গ্রন্থরাজি আজকাল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং তাঁর সম্পর্কে লোকসমাজ তেমন পরিজ্ঞাত না থাকায় জনসমাজে তাঁর যথাযথ পরিচয় ঘটে



না। তিনি আরবের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি হাদীসের খেদমত তিনি কিয়াসে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি কাজীর পদ অলংকৃত করেন। তিনি হিজরী ১৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রাযি তাঁরা আল্লাহর ওপর রাযি। আমীন।

ফিকহের চার বড় ইমামের জীবন ও অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন: *ইমাম আনাস ইবনে মালিক (রহ.): জীবন ও অবদান*, ইমাম *মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী (রহ.): জীবন ও অবদান*, *ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (রহ.): জীবন ও অবদান* ।

# গ্রন্থপঞ্জি


॥আ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. আবদুল কাদির আল-কুরাশী: আবু মুহাম্মদ, মুহ্উদ্দীন, আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নসরুল্লাহ আল-কুরাশী (৬৯৬–৭৭৫ হি. = ১২৯৭–১৩৭৩ খ্রি.), ***আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানীফা***, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

৩. আবদুল হাই লাখনবী: আবুল হাসানাত, মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে মুহাম্মদ আবদুল হালীম আল-আনসারী আল-রাখনবী আল-হিন্দী (১২৬৪–১৩০৪ হি. = ১৮৪৮–১৮৮৭ খ্রি.): ***আন-নাফি'উল কবীর শরহুজ জামি আস-সগীর***, আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৪. আবদুল হাই লাখনবী: আবুল হাসানাত, মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে মুহাম্মদ আবদুল হালীম আল-আনসারী আল-রাখনবী আল-হিন্দী (১২৬৪–১৩০৪ হি. = ১৮৪৮–১৮৮৭ খ্রি.): ***আস-সিআয়া ফি কাশফি শরহিল বিকায়া***, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান (১৩৯৫ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

৫. আবু দাউদ আত-তায়ালিসী: আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনুল জারূদ আত-তায়ালিসী (১৩৩–২০৪ হি. = ৭৫০–৮১৯ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৬. মোল্লা আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০–১০১৪ হি. = ০০০–১৬০৬ খ্রি.): ***শরহুল ফিক্হ আল-আকবর***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৭. মোল্লা আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০–১০১৪ হি. = ০০০–১৬০৬ খ্রি.): ***শরহু মুসনাদি আবী হানীফা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৮. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪–২৪১ হি. = ৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ই॥

৯. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯–২৩৫ হি. = ৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), ***আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার***, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১০. ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী: আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী (২১৩–২৭৬ হি. = ৮২৮–৮৮৯ খ্রি.), ***আল-মাআরিফ***, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া আল-আম্মা লিল-কিতাব, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১১. ইবনে খালদুন : আবু যায়দ, অলীউদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খলদুন আল-খাযরমী আল-ইশবীলী (৭৩২–৮০৮ হি. = ১৩৩২–১৪০৬ খ্রি.), ***দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী তারীখিল আরব ওয়াল বারবার ওয়া মিন আসিরিহিম মিন যাওয়ীশ শানিল আকবর = তারীখু ইবনি খালদুন***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১২. ইবনে খাল্লিকান : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবু বকর ইবনে খাল্লিকান আল-বারমাকী আল-ইরবিলী (৬০৮–৬৮১ হি. =

১২১১–১২৮২ খ্রি.), *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (১৩১৭ হি. = ১৯০০ খ্রি.)

১৩. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯–২৭৩ হি. = ৮২৪–৮৮৭ খ্রি.), *আস-সুনান*, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

১৪. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮–২৩০ হি. = ৭৮৪–৮৪৫ খ্রি.), *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ও॥

১৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ : আবু আবদুল আযীয, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, আহমদ ইবনে আবদুর রহমান আল-ওমরী আল-ফারূকী মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১১০–১১৭৬ হি. = ১৬৯৯–১৭৬২ খ্রি.), *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

॥ক॥

১৬. আল-কাস্তাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, আল-মাকতাবাতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর (সপ্তম সংস্করণ: ১৩২৩ হি. = ১৯০৫ খ্রি.)

১৭. আল-খতীবুল বাগদাদী: আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বাগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), *তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বাগদাদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)



॥গ॥

১৮. আল-গাযালী : হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তূসী (৪৫০–৫০৫ হি. = ১০৫৮–১১১১ খ্রি), *ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান

॥ত॥

১৯. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪–৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥ম॥

২০. আল-মুওয়াফ্ফিক আল-মাক্কী: আবুল মুওয়াইয়িদ, আল-মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ আল-মক্কী আল-খাওয়ারযিমী (৪৮৪?–৫৬৮ হি. = ১০৯১–১১৭১ খ্রি.), *মানাকিবুল ইমামিল আয'ম আবী হানীফা আন-নু'মান*, মজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফ হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩২১ হি. = ১৯০৩ খ্রি.)

২১. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি*

*আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

॥য॥

২২. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.): *তাযকিরাতুল হুফ্ফায = তাবকাতুল হুফ্ফায*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

২৩. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.): *মানাকিবুল ইমাম আবী হানিফা ওয়া সাহিবায়হি*, লাজনাতু ইয়াহইয়ায়িল মাআরিফ আন-নু'মানিয়া হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

২৪. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.): *মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮২ হি. = ১৯৬৩ খ্রি.)

২৫. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.): *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)



২৬. আর-যিরিকালী : খায়রুদ্দীন ইবনে মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ফারিস আয-যিরিকালী (১৩১০–১৩৯৬ হি. = ১৮৯৩–১৯৭৬ খ্রি.), *আল-আ'লাম*, দারুল ইলম, বয়রুত, লেবনান (পঞ্চদশ সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥স॥

২৭. আস-সাখাওয়ী : শামসুদ্দীন, আবুল খায়র, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান ইবনে মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (৮৩১–৯০২ হি. = ১৪২৭–১৪৯৭ খ্রি.), *ফাতহুল মুগীস বি-শরহি আলফিয়াতিল হাদীস লিল-ইরাকী*, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

২৮. আস-সায়মারী : আবু আবদুল্লাহ, আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আস-সায়মারী আল-হানাফী (৩৫১–৪৩৬ হি. = ৯৬২–১০৪৫ খ্রি.), *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী*, আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

২৯. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), *তাবয়ীযুস সহীফা বিমানাকিবি আবী হানীফা*, দারু ইয়াহইয়ায়িল উলুম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)